উপাখ্যান

লুৎফর রহমান

অন্তর্গত একটি বুদ্‌বুদ

গড়িয়ে যায় মার্বেলটা
জলের তরঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাছ রাঙার ডাক
আলোর কলস কাঁকালে প্রান্তরে প্রান্তরে
জোনাকি মেয়েরা—
স্তব্ধতা চেরা ট্রেনের দীর্ঘ হুইসেল,
জীবন হন্তারক ধাবমান মৃত্যু ছুটে চলে
আকাশের আঁচল থেকে খসে পড়া উল্কা ছুটে
ফাগুন হাওয়া,
ঝর্নার তরল রূপা ছোটে,
দুরন্ত ছুটে যায় হৃদয় উষ্ণতায় বিদ্ধ করে অন্য হৃদয়,
টুপ করে ঝরে পাতায় জমে থাকা রাতের অশ্রু
সুপক্ক জাম, ক্ষীণায়ু বুদ্‌বুদ, অনিরুদ্ধ অসমপ্রেম,
পূর্ণচাঁদের খরতর যৌবন, পিতলের চিকানো চমক
ঝরে যায়, ঝরে যায় সব কিছু—

নড়েনা
পাথরের গহীনে গতরে গাঁথা স্তব্ধতা
অমারজনীর অন্ধকার,
মনের শিকড়ে-বাকড়ে লেগে থাকা ময়লা-ঝুল,
নড়েনা।

সুবিনয় বয়সের বৃত্ত ভেঙে সীমাহারা জীবনের বহুধা ব্যাপ্ত রকমারী নকশীবৃত্তে প্রবেশ করে। অনেকক্ষণ পর এই মাত্র মেখলার দ্বিধা বিভক্ত অস্তিত্বের কয়েকটি কক্ষ ঘুরে ও এখন বড়ই ক্লান্ত। মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ঘানির সমান। সময় যতো গড়ায় ওজন যেনো তত বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে জীবনের দায়। ফেলে দেয়াও যায় না, বহন করবারও কক্ষমতা নেই। বড় ক্লান্ত লাগে। সত্যি, মেখলার কথাগুলো কেমন যেনো বিরক্তি কর— দীর্ঘদিনের পাওনাদারের তাগাদার মতো। কিংবা এমনও হতে পারে, মেখলার কাছে সুবিনয়কেই মনে হয় অপ্রয়োজনীয়! নিজেকে কৌশলে সে-ই অপ্রিয় করে তুলছে সুবিনয়ের কাছে! নিশ্চয়ই, ওর মা মেখলার মনকে সুবিনয়ের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছে। ভদ্রমহিলা কেমন শকুনের চোখে তাকায়— আর তাকানোর সাথে সাথে চোখের মণিতে নখর গজাতে থাকে। সুবিনয়ের মনে হয় চোখ দিয়েই ভদ্রমহিলা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে। সবিনয় বুঝতে পারে, আদর সোহাগ দিয়ে অমন ডাগর করেছে, শিশিরের মতো টলটলে মেয়েটিকে পাড়ার মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছেলে ছোঁ মারার

কায়দা খুঁজে বেড়াচ্ছে তা কোন্ মা সহ্য করতে পারে! জীবনে সফলতার সম্ভাবনার আকাশে সবিনয় কোনো নক্ষত্র নয়, সে জানে। জানে, তারপরও বেঁচে থাকার সংগ্রামে কারও পেছনে পড়ে থাকবার লোক সে নয়। কিন্তু মেঘলার মা এ কথা জানবে কেনো? তাঁর চোখ তো দিগন্তের ওপারে ভিন্ন আকাশে, যেখানে ন্যায় বা অন্যায় বড় কথা নয়; নৈতিক অনৈতিকতার প্রশ্ন নয় প্রাপ্তিটাই আসল সেখানে। মেয়েকেও হয়তো তিনি সকাল, সন্ধ্যা জলপাই তলায় সুন্দরবনের বাঘ দেখাচ্ছেন। মেখলার মন দুইটা— একটা তার নিজের সেখানে খানিকটা দখলি স্বত্ব সুবিনয় দাবি করতেই পারে। তদুপরি সকালের জোয়ার বিকেলের জলোচ্ছ্বাসে অনামিকার অঙ্গুরিয়ের মতো বার বার হারিয়ে কদ্দূর ভেসে যায় সুবিনয়, আবার কুড়িয়ে আনে যেনো বালিকার পছন্দের ঝিনুক। এখানেই যতো মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়, সব তার একার। এখানেই অতি সমান্য একটু জায়গা রেখেছে মেখলা; সুবিনয় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে যেনো। মেখলার আর এক মনের নিয়ন্ত্রণ আত্মীয় পরিজন, মা-বাবা, ভাই-বোনদের দখলে। তার যে, যা বোঝে তাই বোঝ; যে, যেভাবে চলতে বলবে সেভাবেই চলো; তাদের পছন্দই মেখলার পছন্দ। যেনো সে আলাদা কোনো অস্তিত্বই নয়। পুতুল তো জড় তাকে নাচালে আনন্দ ও কষ্টের যে অনুভূতি সে তো যে-নাচায় তার, পুতুলের তো কষ্ট ও যন্ত্রণা কোনোটাই নেই। মেখলার কষ্টগুলো তার নিজের, যারা নাচায় তাকে তাদের কেবল মজা। তারা যে, কাউকে নাচাচ্ছে, এই সুখে আত্মহারা। সুবিনয় এসব মেঘলার মুখেই শুনেছে।

টেলিফোনে মেখলার কথাগুলো বেশ ছেঁড়া ছেঁড়াভাবে ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল কথাগুলো কেউ ট্রাফিক পুলিশ যেমন চলন্ত গাড়ি হাতের ইশারায় থামিয়ে আবার ছেড়ে দেয় তেমন। সুবিনয় বুঝতে পারছিল বক্তার প্রাণের গহীন থেকে উৎসারিত আবেগ থরোথরো কথা নয় এগুলো। চৈত্র মাসের বাতাসে নেচে নেচে ভেসে চলা তুলার মতো ভেসে ভেসে আসছিল অনিচ্ছুক হৃদয়ের কথারা। মেখলা এমন এক খেলায় মেতেছে যার শুরুর শেষে ফলাফল একই থাকে বরাবর। যখন খুশি, তার বিচিত্র বর্ণ ও সৌরভমুখর বসন্তকালীন ফুলেভরা এক সজীব বাগান হয়ে কাছে আসে। তখন মুখের অভিব্যক্তি চোখের অবাক করা ঘূর্ণি দেখে মনে হয়, জীবনটা কি জাদুময়ই না হতে পারে যদি এই মূর্ত আনন্দ-ঝর্না এভাবেই কলকল করে সারাক্ষণ পাশে দিয়ে চলে বয়ে। কিছুক্ষণ পর আবার টর্নেডোর মতো হঠাৎ উড়ে চলে যায়। চলে যায় কিন্তু যাবার আগে টুকরো করে ছিঁড়ে পায়ের তলায় পিষে রেখে যায় সম্পর্ক-ফুল। তারপর আবার কিছু দিন দিনমান প্রান্তরের শূন্য বুকের উপর দিয়ে বাতাসের হা-হা কান্নার শ্রোত বয়ে যায়। বিদ্যুতের তারে ঝুলতে থাকে ভালোবাসা-বাদুর। চেতনাবচেতনের খেয়াঘাটের কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে বসে যেনো বেদনা বেহাগে তার বীণ বাজায়। দেখা হয় না, কথা হয়।

তারপরও একটা সম্বন্ধ তো আছেই এই মেখলার সাথে। চরম অপরিচয় থেকে কতকটা পরিচয়ের এই জগতে পা রাখতে অনেকগুলো সময় নিঃশেষিত আজ। অনাথ বহু রাত গেছে অনিদ্রার পথে প্রান্তরে বোহেমিয়ান তরুণের মতো হেঁটে হেঁটে। শতবার নিমগ্নতা ভেঙেছে নিবিষ্ট কর্ম মুহূর্তের। স্মৃতির খড়বিচালি যৎসামান্যই জমেছে, তাও জতুগৃহের মত মুহূর্তে পুড়ে ছাই হবার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রতিদিনই ফোনে কথা চলে, সময় গড়িয়ে হারায় কালের আবর্জনার স্তূপে কথা বন্ধ হয় না। প্রয়োজনের হাজারটা কথা তাতে প্রাণের পরশখানি থাকে না কখনও। দেখা হয়, চোখে চোখ পড়ে। সে দেখাও নিরক্ত— নদী পথে যেতে যেতে পিছন ফিরে তীর দেখার মতো। একজন নারীর চোখে পুরুষকে সম্মোহন করবার যে-রাগানুরাগের ধার পুরুষসত্তাকে রক্তাক্ত করে কখনও তাও থাকে পর্যাপ্তই— কিন্তু কোথাকার একটা পিছুটান সতর্ক করে দেয় যেনো ডাক দিয়ে। যেনো বলে—সাবধান আর এগোসনে। এগোয় না সে।

ফলে সম্পর্কটা একটা জায়গায় ঝুলে গেছে ফাঁসির রসিতে যেমন ঝোলে আত্মহননকারীর লাশ। মেখলাকে বুঝিয়ে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা সুবিনয়ের প্রতিদিনের হাজারটা কাজেরই একটা, তাই ওকে নিজের বৃত্তেই বিঘ্নহীন পরিচিত পথে চলতে দিতে চায় সুবিনয়। ইচ্ছে করেই ফোন করে না, দেখাদেখি না হলে মনটা শিং মাছের কাঁটার খোঁচা খাওয়ার পর মুহূর্তের যন্ত্রণায় টাঁটায়, তবু ফোন করে না। আজকের এই সময়ে মানুষ অনুরোধ করে সম্বন্ধ পাতিয়ে ফোন করে অথচ মেঘলা সাত বছরের সম্পর্কের মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়েও ফোন ধরে না। করে নিজের খুশি মতো। হ্যাঁ, মেঘলা তার খেয়ালখুশি মত ফোন করে অন্তরের সুবাস ছড়ায় দূর থেকে। মনটা কেমন হা-হা খাঁ খাঁ করে। বস্তুত এই ক্ষুদ্র পরিসরের জীবনে এ সব ধুলিখেলার কোন অর্থও খুঁজে পায় না সুবিনয়। এমনকি ভাবনার সঙ্গে তার সম্পর্কের ঝুলন্ত রক্তাক্ত অবয়বটির কথাও তাকে বলে না। কেন যেনো নিষ্প্রয়োজন বোধহয়, উৎসাহ পায় না। কখনও মনে হয়, মেখলার কোনো দ্বিতীয় সম্পর্ক আছে কোথাও এবং তার সাথে ঠুকাঠুকির অবসরে নিজেকে যেনো ফাঁকা মনে না হয় একেবারে, তাই হয়তো সুবিনয়কে আঙুলে বাজিয়ে রেখেছে। এরূপ মনে হবার কারণ সেদিন মেখলাকে যার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটতে দেখেছে মাদকসেবী বলে তার বেশ ভালো নাম আছে। একজন মাদকসেবীর সাথে মেখলার মতো একটি ধারালো তীক্ষ্ণ যুবতীর ঘনিষ্ঠ হবার কারণ খুঁজে পায় না সুবিনয়। নিজের উদারতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে মেখলা। তর্কে তর্কে রক্তাক্ত করে দিতে পারে— তারপরও জেদ যদি না কমে নিজের আঙুল কামড়ে ছিঁড়তে পারে। একবার এমনই করেছিল।

পয়লা বোশেখের দুদিন আগের এক সন্ধ্যায় মেখলার আকস্মিক ফোন পায় সুবিনয়। আতঙ্কিত সুবিনয়ের মনে ভয় ও দুর্ভাবনার সমান্তরাল স্রোত। ফোন রিসিভ করে কোনো দুঃসংবাদ শুনে উত্তরে কি বলবে তার একটা প্রস্তুতি নিতে চেষ্টা করছে, এমন সময় ওপাশ থেকে মেখলার কল্লোলিত কণ্ঠ —

: আমার জন্য পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি হলের গেটে চলে আসো। খুব ইমারজেন্সি, প্লিজ! ভালোবাসার কসম ডার্লিং চলে আসো। না হলে...

নিজের কথা শেষ, ফোনের লাইন কেটে দেয় মেখলা। তারপর বারবার চেষ্টা করেও মেখলার সাথে ফোন সংযোগ করতে ব্যর্থ হয় সুবিনয়। অবস্থা বিচারে মনে হয় মেখলাকে কেউ হয়তো জিম্মি করে রেখেছে। তাই হয়তো কথা বলতে পারছে না। কুকথা জাগে মনে। ওর মনে হয়, 'মেখলা তো মাদকসেবীদের খপ্পরে পড়ে নাই? ঐ ছেলেটি, সেই মাদকসেবী?' স্নায়ু কাঁপে হঠাৎ। দুশ্চিন্তা অজগরের মতো পেঁচিয়ে ধরে। মেখলার জন্য মনটা কেমন কঁকিয়ে ওঠে। কিন্তু এতোগুলো টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে সে। এই অবেলায় কোন্ অজুহাতেই বা মায়ের কাছে টাকা চাবে? এই ভর সন্ধ্যায় ঘরে বসে একজন ছাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কি করবে, কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে তার, যা দেখিয়ে টাকাটা জোগাড় করা যেতে পারে? বুদ্ধিতে নাগাল আসে না। সময় যায় হাওয়ার গাড়ি চড়ে। হার্টবিট বাড়ছে, দ্রুততর হচ্ছে ক্রমে। মাথা গরম হয়ে উঠছে। কি করবে এখন বুঝে উঠতে পারছে না সুবিনয়। আবার ফোন বাজে। মেখলা! রিসিভ করবার আগেই কেটে যায় কল। চরম বিপদ না হলে এরকম করবে কেনো মেখলা ভাবে সুবিনয়। নিরুপায় হয়ে অতঃপর সব খুলে বলে মাকে। বাংলাদেশে একজন মেয়ের কতো অসুবিধাই না হতে পারে। কোনো প্রশ্নের ধার না ঘেঁষেই সুবিনয়কে টাকা দিয়ে সেইক্ষণেই মেখলার হলে পাঠায় তার মা। রুদ্ধশ্বাসে কাছাকাছি যেতেই দেখে দু'তিনটে শপিংব্যাগ হাতে হলের সামনের মাঠের এককোণে দাঁড়িয়ে মেঘের ফাঁকে ঠোঁট বের করা চাঁদের কায়দায় হাসছে মেখলা।

ওকে দূর থেকে ঐ অবস্থায় দেখেই বুকের ভিতরটায় দাউ দাউ আগুন জ্বলে ওঠে। সুবিনয় বলছিল, 'আমার মনে হলো আচারি ব্রাহ্মণ যে-কায়দায় দুই হাতে ধরে জ্যান্ত কবুতরটাকে এক মোচড়ে ঘাড় ছিঁড়ে রক্ত চুষে খেয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়, ঠিক তেমন করে মেখলাকে ছিঁড়ি।' এতো কষ্টে টাকা জোগাড় করে আকাশ সমান দুশ্চিন্তা নিয়ে ছুটে এসে যে দৃশ্য দেখলো তা সবিনয়ের এতোদিনকার বিশ্বাস, আবেগের বালির ভাস্কর্যকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো। এই আচরণের কি অর্থ হতে পারে তা অনুমান করতে পারে না। এ'টা কি নারীর ছলচাতুরীর ঠাসবুননে তৈরি কোনো মজাদার ফাঁদ; অথবা নির্বোধ নারীর হঠকারিতা, না কি এলামেলো মস্তিষ্কের কোনো নারীর চেতনার গহনে পাকানো কোনো পাগলামো বুঝতে পারে না সুবিনয়। 'কাছে এলে কি করবো স্থির করতে পারছি না আমি, ওর আপেলরাঙা গালে কষে চড় দিতে ইচ্ছে হলো আমার, উচ্ছ্বাসের তুলো ছড়িয়ে কাছে এগিয়ে এলো মেঘলা।' একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না সুবিনয়। তার গম্ভীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মেখলার মুখের আলো নিভে যায় হঠাৎ। তারপর বলে—

: '১লা বৈশাখে পরবার জন্য তিনটা শাড়ি আর সাজনের জন্য এটাসেটা কিনছি। আব্বুরে বলছি, টাকা পাইলে ফিরৎ দিবো, তুমি মন খারাপ করছ? তোমার কাছে না চাইলে আর কার কাছে চাইতাম কও?'

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথচ ক্রিয়ার কাল অনুযায়ী কথা বলতে পারে না মেখলা। মেখলার চারপাশের অন্যদের অবস্থাও তাই। অন্য সময় হলে সুবিনয় এ বিষয় নিয়ে দশ কথা শুনিয়ে দিতো কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সম্মুখের এই মেয়েটির জিহ্বার ডগাটা কেটে নেয় এক টানে। এতোগুলো টাকা ধার করে কোনো মানুষ শখ মেটায়? শখের দেখছি তোলায় তোলায় দাম! টাকাটা মেখলার হাতে দিতে দিতে বলে সুনিয়— 'তোমার বাবা কিন্তু ল্যাপটপ ঠিক করবার দশ হাজার টাকাও দেননি। এবার পনের হাজার টাকা দ্রুত পাঠিয়ে দিতে বলো। সাত দিন পর টাকাগুলো দিয়ে এসো, বুঝতে পারছ?'

'কথা বলবার রুচি হয় না, অসহ্য মনে হয় এই জায়গাটা, চারদিকের উচ্ছল সবুজ আর হাওয়ায় হাওয়ায় উড়তে থাকা মানুষগুলো। সন্ধ্যার ছাই মুখে মেখে বাড়ি মুখো হাঁটতে থাকি আমি। পথের শেষটা চোখে পড়ে না আমার। আমি কি শূন্যতার কোনো অতলান্ত অন্ধকার পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করছি? উত্তর জানা নেই আমার, এতোটা সময় অপচয় করে ফেলেছি যে, এখন সব ছুড়ে ফেলে চলে যাবার জো নেই। অথচ কোথাও এতটুকু আলো নেই এই সম্পর্কের ভিতর।'

মেখলা অভিমানী সুবিনয়ের পথের রেখায় দৃষ্টি মেলে ধরে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর ওর অধরপল্লবে এক ঝলক হাসির সবুজ ছড়িয়ে গেটের ভিতরে কোথায় যেনো ঢুকে যায় দিগন্ত ফুঁড়ে অদৃশ্য হওয়া সন্ধ্যার বালিহাঁসের মতো। সুবিনয় তার আর মেখলার সম্পর্কের ভিতর এক রহস্যময় ইঁদুর, বিড়াল খেলার অস্তিত্ব টের পায়। বিছানায় শুয়ে নিথর মধ্যরাতের দেয়ালে ছবি আঁকে ছবি মোছে— নির্ঘুম রাত ফুরিয়ে যায়। 'আমি মেখলাকে ভালোবাসি। কেনো বাসি তা বলা শক্ত। মনের পরীক্ষাগারে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায়নি কেনো ভালোবাসি।'

একজন নারীর বাহ্যিক অস্তিত্বের যা কিছু তার ভালো লাগে সে সব মেখলার মধ্যে নেই। ওর চোখের আকাশ ঘন নীলে, অমল শাদায় গভীরতা ও বিস্তারে এমন নয় যে, জল ধোয়া ছলবলে সে চোখে তাকিয়ে কবিতার বনলতা সেনের জন্য মন কেমন করে উঠবে। মেখলার চোখে তাকালে শূকরের চোখ বলে মনে হয়— যেনো ফুটি ফুটি করছে। ঠোঁটের বারান্দার মতো অধর সুবিনয়ের বড় পছন্দ। মেখলার ঠোঁট ও অধর জলপাই বিচির অবয়বে একটি অতি সাধারণ নারীর মুখ যেনো। চিবুক একটু যেনো বেশিই ঝুলে গেছে কিন্তু সুবিনয়ের পছন্দ স্ত্রী হাঁসের পেছনের অংশের মতো ফোলা ফোলা চিবুক। কোমরটা ছিনো। নিতম্ব বাইরের দিকে ফুলে উঠবে না প্রশস্ত সুগোল। সবিনয়ের এই পছন্দের মানদণ্ডে মেখলার দেহের কাঠামো বিচার করা চলে না। অর্থাৎ সুবিনয়ের ফছন্দের নারী মেখলা নয়। কিন্তু মেখলাকে সে ভালোবাসে। কেনো? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা মেখলার মনের ভূমিরূপ জরিপ করতে পারি। হতে পারে, তার কোনো সবুজ প্রান্তরে যে রসালো সুস্বাদু ফল ফলে তার মিষ্টতায় সুবিনয় আকৃষ্ট। কিংবা কোনো সৌরভ উৎসারী ফুল ফোটে কোথাও যারসুস্নিগ্ধ গন্ধ ওকে উতলা করে! অথবা কোনো গানের পাখির কলকণ্ঠগীতি সুনিয়ের স্নায়ু এলোমেলো করে দেয়! আমরা দেখেছি সেখানেও আলোর ইশরা পর্যন্ত নেই।

মেখলার মেজাজ মধ্যাহ্নের শ্রাবণ আকাশ। মেঘ-রোদে-ঝড়-জলে একাকার। কোনো রঙই তাতে স্থায়ী হয় না। কোনো ছবিই প্রকৃত অবয়বে মূর্ত হয় না। মেঘের লীলায় বনমোষেরা পালে পালে ছুটে চলে অদৃশ্যলোকের কোনো আরণ্যক প্রান্তরে। রোদ ঝাঁ ঝাঁ দুপুর অতিষ্ঠ করে তোলে অস্তিত্ব। কখনও যদি ঝড় ওঠে— ডাল ভাঙে, পাতাপত্রালি ছিঁড়ে উড়ে যায়— উড়ে যায় পাখির স্বপ্ননীড়। ঝড়ের বুদ্ধি বিবেচনা থাকলে কারও কোনো ক্ষতি হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। মেখলার মন কখনও কখনও ঝড়ের স্বভাব পায়। এমন মনের মানুষের সাথে সংসার সমুদ্র পারি দেয়া দুঃসাধ্য। পাথারের বিস্তার নেই মেখলার মনে। যুথবদ্ধ গানের পাখিরা সে মনে পাখায় পাখা বেঁধে কলমুখর উড়ে না; স্বপ্ন-শিশু খরগোশ খেয়ালখুশির স্বরচিত বাগানে ছোটাছুটি করে না; নৃত্য ঝংকারপূর্ণ ঝর্নার প্রবাহ নেই তাতে। 'এতোসবের পরও মেখলাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু কেনো? তা জানা নেই। সম্ভবত মানব সম্পর্ক এমনই।'

মানুষের মনের নাগাল তার ঈশ্বরও পায় কি না সন্দেহ। একটা গল্প মনে পড়লো এ প্রসঙ্গে। গল্পটি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর কাছে শোনা। সে আবার তার মেস জীবনের রুমমেটের ব্যক্তিগত ইতিবৃত্ত শুনিয়েছিল। অর্থাৎ গল্পটা নিছক গল্প বলবার জন্য সৃষ্টি করা নয়, বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার এক কাঠামোবদ্ধরূপ। ঢাকা শহরের এক প্রখ্যাত আবাসিক এলাকার এক মেসে রাতুল, সুভ্রত, মোহিত, ইমরান আরও কয়েক সহপাঠীর সাথে বসবাস করে। প্রত্যেকে তারা একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন। গ্রহান্তরের ছোঁয়া থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো, বাতাস, তিথি-নক্ষত্র, এবং ঋতুর আবর্তনে। ব্যক্তিত্বের ধার বাড়ে, শিক্ষার আলোকে বোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায় তার প্রতিভাস ধরা পড়ে প্রতিটি কর্মে চিন্তায় আচরণে পরিকল্পনায়। রাতুলের অস্তিত্বে লেগেছে সেই ছোঁয়া। ক্লাসে সে সেরা ছাত্রদের সেরা। দুষ্টুমিতে সবচেয়ে প্রাগ্রসর। উপস্থিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে প্রচণ্ড সহায়তা করে। স্বপ্নের বনে সে নিত্য ফোটায় সুগন্ধী হাজার ফুল। যেখানে যে পরিবেশে বসে কেমন করে যে, মুহূর্তে সবার চাইতে আলাদা হয়ে যায় সে! এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের জন্য একবার এক ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যায় রাতুল।

বসন্তের এক আউলা-ঝাউলা বিকেল। বাতাসপরান আকুল করা ফুলের গন্ধ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে অচিন গাঁয়ে তার কোনো এক হৃদয়-বন্ধুর খোলা জানালায়। উদাস হৃদয়, শূন্যতায় হা-হা করে। কয় বন্ধু মিলে তারা মেসবাড়ি পেরিয়ে দক্ষিণের মোড়ের কাছে স্কুলের একচিলতে মাঠের দিকে হালকা চালে হাঁটছে। দশ নম্বর রোডের পনের নম্বর বাড়ির কাছাকাছি যখন ওরা তখন বাড়ির ছাদে বিচিত্র রঙের পোশাকে সজ্জিতা কয়েক জন যুবতীকে দেখলো। আকাশে ডিগবাজি খেতে থাকা বিশষ জাতের কবুতরের মতো উড়ছে। সহসা একসঙ্গে সকলে হাসির বোমা হয়ে ফেটে ছড়িয়ে পড়ে বসন্ত বাতাসে। দেখে মনে হয়, তাদের নিজেদের মধ্যে কানকানির উৎস রাতুলদের দল। যেহেতু তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং সংখ্যায় পাঁচ-ছয়জন, অতএব মনের সাধ মিটিয়ে দুষ্টুমি করে যাচ্ছে। কেউ কাউকে ঠেলা দিয়ে কিছু বলছে— সে আবার অন্যের কানে কিছু বলছে, সাথে সাথে বক্তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে আর একজন। একজন মুখ চেপে ধরলো নীল উড়না যার, তার— মজার শেষ নেই। এক সময় দলের প্রধান মেয়েটি সেলফোনটা খুলে কানের কাছে নিয়ে কথা বলার অভিনয় করে এবং রাতুলের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ছড়িয়ে দেয় ।তার ঠিক কিছুক্ষণ পর কাগজে মোড়ানো কিছু একটা ঢিল ছুড়ে মেয়েটি। রাতুলের সঙ্গীরা এদিক ওদিক তাকিয়ে ভয়ে সরে যায়। ছোঁমেরে কাগজটি তুলে রাতুল। মোড়ক খুলে দেখে ভিতরে একখণ্ড এক টুকরো ইট। কাগজটাই তাহলে পাঠানো উদ্দেশ্য, মাধ্যম ইটের খণ্ড। এবার কাগজের টুকরোটা মেলে ধরলে দেখে তাতে লেখা আছে— টিয়া, তার পাশে ০১৬৩.... সেলফোন নম্বর।

বিশ্বাস হলো না এই মেয়েটির নাম টিয়া হতে পারে। চকচকে মেয়েটি গলে গলে রস হয়ে ঝরে। ফোন নম্বরটা সঠিক কি? নিজেকে প্রশ্ন করে, তারপর নম্বর সহ কাগজটি প্যান্টের পকেটে পাঠিয়ে দিয়ে মাঠের দিকে চলে যায়। অনেক দিন কেটে গেছে. ঐ পথে বহুবার নানান প্রয়োজনে যেহে হয়েছে। টিয়া নামটিও হারিয়ে গেছে নৈমিত্তিক ব্যস্ততার আঁস্তকুড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় একটা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় আচমকা নজরে এলো সেই টুকরো কাগজ। টিয়া, একটি সেলফোন নম্বর। হয়তো যেদিন সে নম্বর ও নামটি পেয়েছিল মেসে ফিরে এসে বইয়ের পৃষ্ঠায় টুকরো কাগজটা সংরক্ষণ করেছিল। আজ এতদির পর শ্রাবণসন্ধ্যায় পেয়ে, কৌতূহল জাগে মনে। 'নাম ও নম্বরটা সঠিক কি না তা তো কোনো দিন দেখা হলো না!' সেই মুহূর্তেই কল করে সে —

: 'টিয়া বলছি, কে?' 'মেয়েটার কণ্ঠে আশ্চর্য মাদকতা। শুধু কথা শুনে শুনেই স্বর্গে যাওয়া যায়! আমি মরে যাই তখনই, জল হয়ে গলে যেতে যেতে কি বলব তাকে, কেনো ফোন করেছি এসব কথার লৌকিক খোসা ছেড়ে কখন বেরিয়ে গেছি মনে নেই। সে যাতে আমাকে চিনতে পারে তার জন্য বলি— একদিন বিকেলে ইটের টুকরো মুড়িয়ে আমাকে নম্বরটি দিয়েছিল যে, আপনি কি সে'ই?' স্মৃতির দেশে ফিরে যায় রাতুল। এ পর্যন্ত বলে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া পেঁচে রাখে অনেকটা সময়। তারপর নিজের দুঃখের বাষ্পগুলো যা সব সময় অন্তরে জ্বালাময় অনুভূতির সাথে দলা পাকিয়ে থাকে তাকে সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে উড়িয়ে দেবার অর্থহীন চেষ্টা করে। আবার আরম্ভ করে রাতুল— 'তার কথার ধাক্কায় উবু হয়ে পড়ে যাই আমি। আরে বোকা পুরুষ! তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমার অপেক্ষারা মরে গেছে, এতোদিন পর মনে পড়লো? ফোনে কথা নয়, কখন কোথায় দেখা করবে এখনই জানাও।' হয়তো কষ্টের ওজন কমাতে দম নেয় সে। আবার শুরু করে তারপর।

'চন্দ্রিমা উদ্যানে দেখা হয় পরদিন নিভু নিভু বিকেলে। অপরূপ টিয়ার নামের সার্থকতা ওর মুখোমুখি বসে উপলব্ধি করি। সারাক্ষণ ওর চোখের ভিতর দিয়া মনের তলটা দেখতে থাকি। টিয়া বলে, সে বিবাহিতা। সুদর্শন স্বামী, খুব ভালো তার। চাকরিতে উন্নতির জন্য নিজেরে উজাড় কইরা দিতাছে। টিয়া কয়, আমি খুব একলা রাতুল, তুমি আমার বন্ধু হও।' বলতে বলতে রাতুলের হাত ধরে ফেলে। তারপর রাতুলকে কতোদিন ধরে এখানে, সেখানে, মেসবাড়ির সামনে, স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠানে দেখেছে সব সময় ধরে বলে যায়। সে আজ সাত বছর আগের কথা।

রাতুল বন্ধু হয়েছিল টিয়ার। একলা নারীর বন্ধু। বিশ্বস্ত বন্ধু একদিন কখন কি করে যে, প্রাণের মানুষ হয়েছিল টিয়া আর রাতুল কেউই তা টের পায়নি। রাতুলের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ হলেও সে মেস ছাড়েনি। একটি কর্পোরেশনে সে খুব ভালো একটা চাকরি করে। সচ্ছল একটি সংসার গড়ার সকল সামর্থ্য আছে তার কিন্তু রাতুলের সংসার নেই। টিয়া আছে, তাদের দুজনের একটা ছেলে আছে। তার বয়স পাঁচ বছর। টিয়ার স্বামীর ছেলে হিসেবে বড় হচ্ছে— কাকের বাসায় কোকিলের ছানা। বাবা ডাকে টিয়ার সামাজিক স্বামী (একথা সে টিয়ার মুখে প্রথম শোনে) সাদিক মোস্তফাকে। রাতুলকে আঙ্কেল বলে গলা জড়িয়ে ধরে। সপ্তাহে একদিন বেড়াতে নিয়ে যায় রাতুল। পার্কে, জাদুঘরে, কখনও গ্রামের দিকে কোথাও। পাখিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, নদী, ঘাস, ফড়িং, প্রজাপতি সবার সাথে ঘনিষ্ঠ হোক অভিনব, তার ছেলে এটাই সে চায়। সন্ধ্যায় টিয়ার সামাজিক স্বামী সাদিক মোস্তফার ঘরে পৌঁছে দিয়ে মেসে ফিরে সমস্ত রাত কাঁদে।

রাতুল কাঁদে নিজের ছেলেটা অন্যের বুকে ঘুমায়! বলে— 'এ কি জীবন দিলো তাকে টিয়া? বুকের ভিতরটা সারাক্ষণ পোড়ায় যে!' টিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে জানায়— বিয়া করলে কুত্তা কামড়া কামড়ি অইবো সকাল বিকাল, এই যে আছি, কতা ভালোবাসো তুমি আমারে, আমিও তোমারে মরণের মতো, এইডাই সুখ।' রাতুল বলে— 'অভিনবকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না যে!' 'ওতো তোমারই সন্তান, তুমি সব জানোই। তোমার আদরে বড় হচ্ছে, আর কি? আমরা দুজনেই তো তোমার, তবে? একজন পুরুষের যা যা প্রয়োজন... কি নেই তোমার?' টিয়া রাতুলকে বুঝায়। গল্পটি একজনের জীবন অথচ গল্প হিসেবে কি অসাধারণ! জীবন যে এমনও হতে পারে রাতুল তার দৃষ্টান্ত। রাতুল যেখানে গল্পের সমাপ্তি টানে— সেখানে একটি রক্তাক্ত ঈগল ডানা ঝাঁপটায় মরে না। অন্যের স্ত্রী তার নিয়মিত শয্যা বিহারের সঙ্গিনী, নিজের ঔরসজাত সন্তান অন্যের ছেলে পরিচয়ে নিজের চোখের সামনে বড় হচ্ছে তার কাছে পিতার দাবি খাটে না। তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা মনে হলে কখনও, মনে হয় মস্তিষ্কের শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে সেই মুহূর্তে। এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই রাতুলের খাপছাড়া জীবন রাজধানী শহরের হাজার গল্পের অন্যতম একটি গল্প হয়ে আজও প্রবমান।

মানব সম্পর্ক এমনই। হয়তো যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে সহজ আকর্ষণ জাগ্রত হয় মনে তার জন্য। কামনা উথলি ওঠে দেহের জমিনজুড়ে। সহজাত দোষে জলের তো কামনা জাগে, পাড় ভাঙে আক্রোশে! সমর্থ বাতাসের কামনায় ফুলে উঠে জলের শরীর। ব্যাকুল আগুনের সুতীব্র কামনা পুড়ে ভস্ম করে তাবৎ ভুবন। লতার কামনা বেয়ে ওঠে বৃক্ষ শরীর। স্খলনের সুখ সুন্দর খোঁজে কে দেখেছে কবে। তৃষ্ণার জল চাই দারুণ পিপাসায়। জলের সাহচর্য, সেও সান্ত্বনা জোগায় তৃষিতের অন্তরে। হয়তো তাই। সুবিনয় মেখলাকে ভালোবাসার আর কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না তার নিজের পক্ষে। 'আমি তাকে সকল গুণের আধারে বিচার করি কিন্তু যতক্ষণ কাছে থাকে মন ভরে থাকে চরম বিরক্তিতে, অথচ দেখা না হলে কেমন এক শূন্যতা বোধ করি মনে।' সুবিনয় এভাবেই তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে নিয়ে ভয়ংকর সংকটকাল পার ক'রে যায় একা একা। মেখলার ফোন এলে সবিনয় তাই ভালোলাগা, মন্দলাগার মিশ্র অনুভূতির করাতকলে চিরতে থাকে। 'এই যে, ভদ্রলোক! হাওয়ার গাড়িতে উড়ে বেড়াচ্ছেন, দুনিয়ায় আর মানুষের খবর কে রাখে?' 'বলে দীর্ঘক্ষণ স্বভাবের প্যানপ্যানানি মহা বিরক্তি কর— ধ্যাত্' সবিনয় বিরক্তি প্রকাশ করে।

সেলফোনটা হাত থেকে বিছানায় নামিয়ে রেখে মেখলাকে মনের খিড়কির সম্মুখে দাঁড় করায় সুবিনয়। ঘাড় বেঁকিয়ে মুখটা কিঞ্চিৎ নামিয়ে ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে আছে মেখলা যেমনটা ওর অভ্যাস— ঐ তো নিজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে— জলের তলে যেমন ডুবে নিক্ষেপিত ঢিল। হঠাৎ চোখের প্রান্তরে ঝড়, উথালি পাথালি সব কিছু— সুবিনয় পলকে হারিয়ে ফেলে মেখলাকে। লক্ষ্যবস্তু দৃষ্টিসীমা থেকে সরে গেলে ক্ষুধার্ত ঈগল যেরকম অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে একটা পাগলা কষ্ট তেমন অস্থির ক'রে তুলছে সবিনয়কে। দম বন্ধ লাগে, কেমন একটা রিনরিনে শূন্যতার ত্বরিত ঝলক ওর অস্তিত্বকে বিদীর্ণ করে। চারপাশের বাতাস এখনও খেলছে ওর কথাগুলোর চারধারে—

: 'আগে বললে সঙ্গে যাইতে পারতাম। কোন দিন সাগর দেখি নাই তো! পাহাড়ও না! আজব তো, না বলেই একাকী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে, বললে যেতাম না? ওহ! এটা ঠিক না, যা চাই সব সময় তাই করি, আমি ওরকম না। হু-ম, তাই। হু-ম কি করছিলে, সঙ্গে কে আছে? নিশ্চয়ই কেউ, তন্দ্রা কইছিল, তুমি ওকে পাগলের মতো পছন্দ করো। তাই কি? এতো যখন পছন্দ করো, তাইলে বিয়া করো না ক্যান?

: 'ঘটকের দায়িত্বটা তুমিই পালন করো। ওকে বলো, ওর জন্যই এতোদিন বিয়ে করি নাই।কি, করছ তো ঘটকালি?'

: তুমি একটা কুত্তা।

এই হলো মেখলা! বলা যায় টর্নেডো— যে পথে যায় সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ একাকার ক'রে চলে যায়। যে কথাগুলো এতক্ষণ ধরে সে বলল তার একটাও সঠিক নয়। কিছু একটা উপলক্ষে ঝগড়া করা চাই, না হলে ওর যেনো মনের স্বস্তি নেই। একা সুবিনয়ের সঙ্গে সমুদ্র দর্শনে যাবার জন্য মনের আদলটি যা হওয়া দরকার মেখলার মন সে'রূপ নয়। সে যোগ্যতা অর্জন করতে যে পরিবেশে যে সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠতে হয় তা সে পায়নি। জন্মগতভাবেই নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্তের সিঁড়িতে উঠতে যাওয়া একটি স্বল্প শিক্ষিত এক পরিবারের সদস্য সে। খুঁটিতে বাঁধা গরুর মতো গ্রামীণ সমাজে নীতি-সংস্কারের বেড়ার বেষ্টনী মধ্যে কেটেছে যৌবনের প্রথম ধাপ। সে এমন এক সসময় যখন নতুন দৃষ্টির আলো ফেলে ফেলে জগতকে দেখতে এবং নিজের সত্তার নতুন উদ্ভাসন দেখাতে দিগন্তের পানে ছুটে যেতে ইচ্ছেরা মরিয়া হয়ে উঠতো পারেনি। খই গোক্ষুরের বিস্তারিত ফণার ফুলে অধরোষ্ঠ ছোঁয়াতে ইচ্ছে হতো খুব, কোনো দিন তা পারেনি। শাসন বারণ ছিল তার সমাজের পরিবারের। আজ জীবনে যখন ভাটার টান শুরু হয়েছে তখন কোন্ সাহসে সে পরিচিত অনাত্মীয় পুরুষের আঙ্গুল ধরে ধেই ধেই করে সমুদ্র সন্দর্শনে যায়?

গায়ের জোরে এ সব হয় না। জোয়ারের বিপরীতে উজান ঠেলে সামনে চলার জন্য অনন্য এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। জীবনের চার পাশ থেকে ঝেঁড়ে ফেলতে হয় ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণতা, সংস্কার ও কুসংস্কার। মেখলার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক্রম ও পরিবেশ তাকে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে— সে আধুনিক হয়ে ওঠেনি, তাই উত্তর-আধুনিক হবার প্রশ্নই ওঠেনি। সেই হিসাবের রথ জীবনপথে এত সরল রেখায় চলে না। অতিক্ষুদ্র একটি বিন্দু নানান বিচিত্র রূপে সর্বময় পরিব্যাপ্ত হয়— জীবন নামে কতো মাত্রায় কতো ভঙ্গিতে কতো রূপে যে-বিস্তৃতি তার হিসাব রাখা দুঃসাধ্য। সে' হিসাব যে রাখে বিন্দুর ক্ষুদ্রত্ব তার অস্তিত্ব থেকে ঘুচে গিয়ে সেখানে বিপুল এক পরিসর সৃষ্টি হয় সেটাই সবকিছুকে গ্রহণ করতে শেখায়— তা'ই উদারতা। প্রকৃতির সাথে নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন ব্যতিরেকে সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠা যায় না। যে উঠেছে সংসারের সকল ক্ষুদ্রত্ব, মালিন্য ছাপিয়ে বিশ্বের অপার সৌন্দর্যের কেন্দ্রে তার পক্ষে সকল সুরের মর্মার্থ অনুধাবন করা অনায়াস সাধ্য। নক্ষত্রের ছন্দময় কোলাহল সে শোনে মাঝরাতের উচ্ছ্বসিত আকাশে, মানস চোখে দেখে আকাশে আকাশে চিত্রাহরিণীর বিস্ময়কর দৌড় প্রতিযোগিতা। ঘাসের পাতায় পাতায় শিশিরের সোহাগের মর্মকথা বোঝে সে। দেখে প্রজাপতির সঙ্গম-স্বেদ রোদের ঠোঁটে কি স্নিগ্ধ মধুর প্রণয়-সুরভি ছড়ায়। জানে সে বাতাসের অন্তর সহস্র কোটি বর্ষের জগৎ-যন্ত্রণা কি পরম যত্নে বয়ে বেড়াচ্ছে। সে এও জানে আত্মপ্রতারণাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে ধরা ধামে। প্রতিটি মানুষের ভিতরটা বাতাসভরা বেলুন— সময়ের-হাওয়ায় উড়ে এখানে ওখানে। বিন্দু থেকে বিস্তৃতির শীর্ষ স্পর্শ করতে যে-অর্জন দরকার তা নেই মেখলার। সে নারী বলে নয়, ওর চেতনার সেই পাড়ভাঙা স্রোতের বেগ নেই— আছে ক্ষমতা লাভের আদিম আকাঙ্ক্ষা। আধিপত্য বিস্তারের মেয়েলী প্রবণতা তার মজ্জায়— তা থেকে বেরিয়ে এসে কাছের মানুষের জন্য ফুল কুড়িয়ে ডালা

ভরা তার দ্বারা সম্ভব নয়। যে পীড়ন আর নিষেধের প্রাচীর ডিঙিয়ে জীবনের নোনতা স্বাদ নেবার এই বয়সে পৌঁছেছে তার অবিস্মরণীয় স্মৃতি, প্রতিশোধ নেবার প্রবল তাড়না তাকে ক্ষমতার প্রতি ঠেলছে বিপুল শক্তিতে। কিন্তু ওর মনের উপরটা ডিমের কুসুমের উপরকার আবরণের মত স্বচ্ছ এবং অতি কোমল। মেখলার ঐ বাহ্যিক সরলতাকেই সুবিনয় ভালোবাসে। ঐ প্রাকৃত গোঁয়ার্তুমিকে জীবনের সবটুকু দিয়ে উপলব্ধি করে পরম মমতায়।

সুবিনয় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জেনেছে— মনের যে-উদারতা যে-বোধ মানুষের পারিবারিক বা সামাজিক মূলবোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে ভিন্ন এক রুচি, সংস্কৃতির আত্মা মানুষের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং ব্যক্তিকে উত্তর-আধুনিক মানুষে পরিণত করে তা সে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্কটটি কেবল তার একার নয়, মধ্যবিত্ত ঘরের যেকোনো মেয়ের মধ্যেই এই সংস্কারজাত দ্বিধা আকাঙ্ক্ষার মধ্যস্থলে প্রাচীর তোলে। মেখলার যুক্তিবোধ তীক্ষ্ণ হতে পারেনি সংস্কারের চাপে। সংস্কার এড়াতে পারেনি বলে সে সংস্কৃত নয়। কিন্তু ওভার স্মার্টনেস প্রকাশ করতে গেলে প্রকৃত বাস্তবতা সামনে চলে আসে। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক তার নিকট একরৈখিক, বিবাহ সম্পর্কের সনাতন বৃত্তে স্থির। একনিষ্ঠাতা মনের না হোক অন্তত দেহে তা রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এক কালে এদেশের মেয়েরা সাত-এগার বছরে বিধবা হয়ে একাদশীসহ নানা কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা দেহজ কামনা নিয়ন্ত্রণ করেছে। দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা নিবৃতির অস্বাভাবিক অবদমন এক ধরনের বিকৃতি বইকি। একালে মেয়েরা জীবনের পঁচিশ-ত্রিশ বছর পার করে দিচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর প্রতিষ্ঠিত স্বামীর অপেক্ষায়। এই সমাজের অভিভাবকগণ একবারও ভাবে না যে, দেহ তার স্বাভাবিক নিয়মেই রক্ত-নদীতে ঘূর্ণি তুলবেই এবং সে ঝড় নিবৃতির প্রাকৃতিক প্রতিষেধ না থাকলে কখনও কখনও প্রলয় ঘটতে পারে, ঘটে যায়।

সমাজ তাকে পরপুরুষ বলতে শিখিয়েছে— স্বামী ব্যতীত জগৎ সম্পর্কের সকল পুরুষকে চিনিয়েছে ঐ নামে। তাই মনের জগতে সে, যে কোনো পুরুষকেই বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবে একটা বড় ফাঁক রেখে। আঙ্গুলে আঙ্গুলের ছোঁয়া লাগলে শিউরে ওঠে পাপবোধে। মনটা যখন এমনই পাপবোধে সদা আতঙ্কিত তখন আধুনিকতা বা উত্তর-আধুনিকতা কেবল পোশাকে, চলনে, বলনেই ধরা পড়ে। একটা দ্বিধার মধ্যে সব সময় আচ্ছন্ন থাকে বলে সহজ হওয়া সম্ভব হয় না কোনো দিন। নারীর মনের যখন এই অবস্থা পা দুটি তখন দুই দিকে প্রসারিত, কোনো দিকেই এগোতে পারে না। মনের গহীনে সুপ্ত সঙ্কোচটি সকল কাজের সামনে এসে দাঁড়ায়— সে বড় মস্ত প্রতিবন্ধক। শামুকের মত খোলসের ভিতরে গুটিয়ে আনে নিজকে— জনমভর তাই করে প্রতিটি নারী। মেখলাও তার পরিবার ও সমাজ পরিবেশ হতে তাই শিখেছে।

বান্দরবান হিলটপে একলা ঘরে সফেদ শয্যায় শুয়ে সুবিনয় শত চেষ্টায়ও মেখলার বৃত্ত ছিঁড়ে বের হতে পারছে না— লক্ষ কোটি প্রসঙ্গ এসে মৌমাছির মত ঝাঁপটে ধরছে। একটার সঙ্গে গিঁট দেয়া অন্য ঘটনা আসছে— তারপর অন্যটা। 'মেখলা তাকে চায় না, তার কাছে আসতে পারে না; তাহলে সম্পর্কের গ্রন্থিটা সে কেনো পাকায়?' নিজকে প্রশ্ন করে সুবিনয়। বয়সের একটা ব্যবধান আছে তাদের। এমন নয় যে একজনের যৌনক্ষমতা বিলুপ্ত, এমন নয় যে একজন অপর জনকে পছন্দের সীমানায় স্থান দিতে অনিচ্ছুক। দুজনের চোখের ভাষায় অনুরাগের অগ্নিঝড়, কামনার গোক্ষুর ফণাবিস্তার করে সেখানে। কিন্তু মেখলার মধ্যে সকল সময় একটা সতর্কতা লক্ষ্য করে সুবিনয়— যেন সে পূর্বেই স্থির করে রাখে সাগর দেখবে, তরঙ্গের গর্জনে, সাগরের বিশালতায়, বিস্তারে মুগ্ধ হবে, তীরে বালুবেলায় দাঁড়াবে কিন্তু জলে নামতে বললেই দৌড়ে পালাবে। এ যেন সেই বাউল গানের অবস্থা— জলে নামব, জল ছিটাব জল তো ছুঁব না। জল না ছুঁলে জলে নামার দরকারই বা কি! ব্যাপারটা সুবিনয়কে ভাবায়, অনেকবার ভাবে সে। এক সময় সে আবিষ্কার করে— যৌনতাকে এ দেশ ধর্ম জ্ঞানে গ্রহণ করেছে। কৃচ্ছ্রতা সাধনেই তার আত্মার মুক্তি। শুদ্ধ নারী স্বর্গবাসী হবে এই সমাজের স্বীকৃত সত্য এটাই। নারী তাই নিজকে শুদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর। সেই শুদ্ধতা আবার দেহকেন্দ্রিক— আপনার গহীন চৈতন্যে একজনকে, অনেককেই কাঙ্ক্ষিত মনে করতে পার, অন্তর্গত অস্তিত্বে তাকে দেহে-মনে কামনা করো দোষ নেই কিন্তু দেহের মন্দিরে সেই পূজারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। সমাজের আতশ কাচের ঠুনকো চকমকিটা নষ্ট হয়ে যাবে। বহু ব্যবহৃত শাস্ত্রের জীর্ণ, দীর্ণ পাতায় পাতায় অশুচিতার গভীর দাগ পড়বে।

সুবিনয় বোঝে, মানুষ নামক প্রাণীটির স্বাভাবিক যে-প্রবণতা তার বিপরীত এই কৃচ্ছ্রতা সাধন, এ নিতান্তই যান্ত্রিক প্রচেষ্টা। জড়ের জন্যও এমন নিয়ম অসহ্য। যা স্বাভাবিক তাকে নিষেধের দ্বারা আটকে দেয়া হয়েছে— নিষিদ্ধ যা, তা গোপনে কর তাতে পাপ নেই। অন্যে না জানলে না দেখলে অপরাধের দায় তার টিকিটাকে স্পর্শও করতে পারবে না। সমাজকেই যত ভয় নিজের জন্য যা প্রয়োজন অন্যের ভয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান কর, চমৎকার আত্মপ্রবঞ্চনা। মনগড়া শাস্ত্রের বিধানদাতা পুরোহিতের হাতেই বিনষ্ট হয়েছে নারীর পবিত্রতা, শুদ্ধতা। সেবাদাসীদের অজস্র ইতিবৃত্তে তার পীড়ন-নিপীড়ন চিহ্ন কলঙ্ককালিতে দাগকাটা আছে। নারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে তাকে মা বলে দেবীর আসনে বসিয়ে অন্য নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে এই সমাজের পুরুষ। অন্তরে বাহিরে তারা ভয়ঙ্কর কপটাচারী। শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ নারীশাসন ইতিবৃত্তে ঠাসা। তার পঁচানব্বই ভাগ নারীর অধিকার হরণ ও তার জন্য নিষিদ্ধ কর্মের তালিকা ও শাস্তির বিধান বিষয়ক বয়ান। যেনো জগতের সকল কর্মের দায় একা নারীর। এমনকি পুরুষের স্বর্গযাত্রা পথের অন্তরায়রূপে দেখানো হয়েছে নারীর জন্য পুরোহিত তন্ত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজকে। প্রতিদিনের জীবনের হিসেব— আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, অভাবের যাতনা ভুলে অপার্থিব যে-জীবনের ছবি ধর্মগ্রন্থের বাইরে আর কোথাও নেই মানুষ তার জন্য কৃচ্ছ্রতা সাধনে মরিয়া। এমনিভাবে অমানবীয় সমাজে সহস্র বছর আপন অস্তিত্বের নিভৃত কোণে এই সমাজের প্রতিটি মানুষ আত্মপ্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনাজাত সহ্যাতীত এক কষ্ট ভোগ করে। তার ফলে সৃষ্ট বিচিত্র ধরনের বিকৃতিকে জীবনভর বয়ে চলেছে। এখানে মানুষ এখনও বিশ্বাস করে ধর্মপালনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার স্রষ্টা। মনে আছে দাদু একদিন সুবিনয়কে ব'লেছিলেন—

: ভগবানের লীলে দেখ, এই ধরাধামে তাঁর নাম, তাঁর অনন্ত বিভূতির কথা সঙ্কীর্তন করবে কে? মানুষকে তিনি পাঠালেন; তারা অন্ততকাল নিজেদের মঙ্গলের জন্যই দিনরাত্রি তাঁরই নামকীর্তন, গুণকীর্তন কইরে যাচ্ছে। কায়দা দেখ! তোমার সবই তো ভগবানের জন্য। নিজের বইলে কিচ্ছু নাই তোমার।

সুবিনয় নিজের অতলে ডুব দিয়ে দাদুর বিশ্বাসের রশি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তল থেকে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত একবারে পরিমাপ করে, শতবার করে তবু শেষ হয় না রশি। বড় দীর্ঘ সে রশি, অদৃশ্য কিন্তু তার অস্তিত্ব সর্বত্র স্পষ্ট— মর্ত থেকে শেষ স্বর্গের নানা ধাতু নির্মিত সিঁড়ির সর্বশেষ ধাপ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুবিনয়ের নীরবতা দাদুকে তছনছ করে দেয়— কেন দেয়, সুবিনয় বুঝতে পারে না। নীরবতাও তবে কখনও কখনও সংলাপের অধিক বলীয়ান হয়ে ওঠে! ধারালো খড়্গের মত তা কেটে দিতে পারে মিথ্যার অতিকায় শরীর। ভাবে সুবিনয়, ভাবতে ভাবতে বোধের অতীত সে অর্থহীন প্রয়োজনের বৃত্তে মিথ্যার ঘানিটানা অবস্থায় দাদুর মত কোটি মানুষের ভোতা বিষণ্ন মুখ দেখে দমে যায় সে। শব্দের শক্তি স্তব্ধতা ও স্থবিরতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ মাত্র অস্তিত্ব জুড়ে প্রাণের সবেগ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে— তা দৃশ্য ও শ্রবণবিশ্বে তাৎক্ষণিক এক অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। কিন্তু নীরবতার ক্ষমতা আরও প্রচণ্ডতা নিয়ে চারপাশের পরিবেশকে বিদ্রুপ করে, সবার অস্তিত্বকে নাই করে দিয়ে স্বয়ং মূক হয়ে যায়। নড়ে না, নিঃস্পন্দ পড়ে থাকে। সেই মূর্তিটি সকলের চিত্তে ভয়ের ট্যাটা সেঁধিয়ে দেয়। হয়তো মানুষের ঈশ্বরও চমকে উঠেন সেই প্রস্তর কঠিন নীরবতার দাপটে। ভয়ার্ত দাদু বলেন—

: 'দাদু ভাই, এত কী ভাইবছ? জগতের সবতাতেই শুধু মায়া, ভালোবাসা সেই মায়ার ভুবনে প্রবেশের একমাত্র মন্ত্র— সর্বত্র ভগবান আছেন, তিনি যা চান তাই ঘটে, তিনি জানেন না এমন কিছু নেই, এমন কিছু নেই যা তার অনিচ্ছায় ঘটে। অন্তরে তারেই ধ্যান কর সব পাবে।'

: 'কতবার জন্মেছি জানি না। কোনো জন্মেই আমার জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে নাই, শুধু এইটুকু মনে আছে। তোমার ভগবান, আমার ভগবান থেকে আলাদা হয়ে যায়। আমার ভগবান বলেন, 'তুই এক মহাস্রোতের ক্ষুদ্র বালিকণার সহস্রকোটি ভাগের একভাগ, আমার হিসেবে তোর কোনো প্রয়োজন নেই। ভেবে দেখ তুই যা নস তা সব কত সুন্দর, কত বিশাল, কত শক্তিধর— তার প্রাণের নিখিলে জাগ্রত সুর কত মোহনীয়, মরণের আর জীবনের মাঝে যে জাদু আছে তার কিছু তোর বুঝবার ক্ষমতা নেই। কেবল প্রতিটি মুহূর্তের বিশ্বলীলা দেখাই তোর কাজ। তুই মুক্ত, শুধু

রাতুল বন্ধু হয়েছিল টিয়ার। একলা নারীর বন্ধু। বিশ্বস্ত বন্ধু একদিন কখন কি করে যে, প্রাণের মানুষ হয়েছিল টিয়া আর রাতুল কেউই তা টের পায়নি। রাতুলের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ হলেও সে মেস ছাড়েনি। একটি কর্পোরেশনে সে খুব ভালো একটা চাকরি করে। সচ্ছল একটি সংসার গড়ার সকল সামর্থ্য আছে তার কিন্তু রাতুলের সংসার নেই। টিয়া আছে, তাদের দুজনের একটা ছেলে আছে। তার বয়স পাঁচ বছর। টিয়ার স্বামীর ছেলে হিসেবে বড় হচ্ছে— কাকের বাসায় কোকিলের ছানা

আনন্দের ডুম্বরু বাজা, মহাগতের বীণাতারে জেগে ওঠা সুরে সুরে নেচে গেয়ে জগৎ পাগল করেদে।

: ছি! দাদুভাই! এ সব বইলছ কী? ভগবান অখুশী হইবো। সর্বগুণের আধার ভগবান মানুষকে তাঁর দাস কইরে পৃথিবীতে পাঠাইছেন, তাঁর ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, ও ভাবে বইলতে নেই। তুমি সব রস আস্বাদন কইরবা, তোমার মাইধ্যমে রসের আধার ভগবানও আস্বাদন কইরব। এইডাই তো তার লীলা।

মনে আছে অসংখ্য পুরনো মুদ্রা ঘষে ঘষে সেই একখণ্ড বিকেল পার করে দাদু। দাদুর বাবার হাতের কোন্‌টির; দাদুর বাবার দাদুর কালে বিপুল তেজ ছিল কোনটির সে সব নিয়ে চলে হিসেব। পুরনো সিন্ধুকটার একটা চেম্বার ভর্তি স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, কড়ি, কাগজের বিভিন্ন মুদ্রা রক্ষিত আছে। প্রায়ই দাদু ওগুলো বের করে পরীক্ষা করে। অনর্গল কথা বলে ওদের সঙ্গে। মুদ্রাগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অনেক হয়তো— কিন্তু বাজারে ওরা কানা মুদ্রা; অচল বলেই কানা। এরা কেউই নিজে চলতে পারে না একাকী। সবচেয়ে নির্বোধ মানুষটিও ঐসব কানা মুদ্রার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য দিতে সম্মত হবে না— বিষয়টি দাদুও জানে। সংসারের খরতাপে অন্তরের সবুজ প্রান্তরের লকলকে সব ঘাস যখন পুড়ে খড়ি হয়ে ওঠে তখন দাদু সিন্ধুক খুলে ঐ মুদ্রাগুলো বের করে ওল্টে পাল্টে দেখে, পরম যত্নে ভক্তি ভরে গালে ঠেকায়। সম্ভবত নৈমিত্তিক যন্ত্রণা যখন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে তখন পূর্বপুরুষের দুঃখহরা স্পর্শের জন্য মনটা হাসফাঁস করে। মুদ্রাগুলোর মধুর ছোঁয়ায় মনটা আবার চাঙ্গা হয়। দাদুর বিশ্বাসগুলো সহস্র বছরের পুরনো মুদ্রা যেনো— আসলে অভিন্ন তারা। কীটে খাওয়া গ্রন্থের পাতায়, শেওলাপড়া প্রস্তরগাত্রে সে সব বিশ্বাসের মূল প্রোথিত। দাদু কথা বললেই সুবিনয় বোঝে—

বৈদিক জোসনায় হাঁটছেন ঠাকুরদা — কখনও মৌর্য-সূর্যের খরতাপ কঠোর কৃচ্ছতার বিনে সুতায় বাঁধছে তারে, অর্থশাস্ত্রের হিসাব তার উচ্চারণে। মনে হয় কখনও তিনি গুপ্তযুগের বাৎসায়ন, মাঝে মধ্যেই মনে হয় মাত্র পথের মোড়ের দোকানে ঋষি মনুর সঙ্গে চা খেয়ে এলেন। এত নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে মানুষ কি করে যে বাঁচে! সময়ের সঙ্গে যা উড়ে গেছে হারিয়ে ফুরিয়ে তাকে এমন করে আকড়ে ধরে বাঁচবার মধ্যে আনন্দ কোথায় ভেবে পায় না সুবিনয়। 'দাদুকে খুচিয়ে ভালো লাগে আমার' সুবিনয় স্মিত হাসির সঙ্গে বলে। দাদু যা বলেন সুবিনয় সে কথাগুলো হয়তো বিশ্বাস করে না, করলেও সে সব এখন দাদুর সিন্ধুকে রক্ষিত কয়েনগুলোর মতোই অচল জ্ঞানেই বিশ্বাস করে। অথচ কথাগুলো হুবহু মনের খাতায় লিখে রাখে। আবার কোনো অবসরে এভাবেই মনে মনে আওড়ায়—

: আমার চাচা ছিলেন সেকালেরর ডেপুটি, ইংরেজি বলত, ইংরেজদের মত, সমস্ত জীবনে কখনও নৈমিত্তিক ছুটি কাটায় নাই, অনুগত কর্মকর্তা কা'কে বলে! সরকারের নিমক খেয়ে, তার সাথে বেইমানি করে নাই কোনদিন; এমনই সৎ কর্মকর্তা। অমন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা একালে কোথায় পাইবা, তার সাথে বেইমানি করে নাই কোনদিন এমনই সৎ কর্মকর্তা। অমন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা একালে কোথায় পাইবা!

: বলবার মুহূর্তে অহঙ্কারে দাদুর মুখমণ্ডল ঔজ্জ্বলে ভরে যায়। আমি তাঁর অস্তিত্বে ঔপনিবেশিক হিংস্র দানবের ভয়ংকর ছায়া দেখি, যে-দানব ধারালো নখে আঁচড় কেটে চলে গেছে কিন্তু তার ঘা এখনও শুকায়নি। কোনো কালে যে, শুকাবে তা কল্পনাও করা যায় না। দাদুর মত কোটি কোটি মানুষ সেই দুষ্টক্ষতের ভিতর শাসকচক্রের বর্বরতার ও পাশবিকতার পরিবর্তে রানী ভিক্টোরিয়ার হায়েনাগুলোর মধ্যে মহত্ব আবিষ্কার করে আপ্লুত হয়, তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রশংসার মধ্যে সুবিনয় কোথায় যেনো দেবতার প্রতি নিবেদিত স্তবের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। উপনিবেশিতের যথার্থ চরিত্রটি ফু'টে ওঠে বাঙালি ইংরেজের প্রতি সভক্তি প্রশংসায়। কোথায় শত্রুজ্ঞানে তাদের ঘৃণা করবে, তা না ক'রে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কি করুণ! অথচ ইতিহাসের পাতার ভিতর হতে সত্যের বাঘটি হালুম শব্দে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বলে—

"ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে দু'শ বছরের পরজাতির চিন্তা প্রবাহ নিরন্তর বইছে, নিজের বলতে ওর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। কি ভয়ঙ্কর, যে মাথাটা 'ও' বহন করছে তার ভিতরকার মগজটা অন্যের, ভাবনাটা অন্যের, ভাবনার ধরনটা অন্যের!" গা শিহরিত হয় ভাবলে, অপরের একটা সমগ্র মস্তিষ্ক নিজের মাথায় ধারণ এবং তার মাধ্যমে স্বীয় কল্যাণচিন্তার বিষয়টা আরও ঘৃণ্য মনে হয় সুবিনয়ের। 'এই চিন্তাটা আমার ভিতর ধীরে ধীরে তার শিকড় প্রোথিত করছে— চিরে ফেঁড়ে যাচ্ছে অস্তিত্ব। কোনো কিছুতে মানুষের বিশ্বাসকে এখন দুরারোগ্য একটা ব্যাধিই মনে হয়। জাতির মগজ চুরি হয়ে গেছে কোনোরূপ অস্ত্রোপচার ছাড়াই! এবং তারা অন্যের মগজ দ্বারা নিজের কল্যাণচিন্তা করে? অবাক কাণ্ড! মাঝে মধ্যে এমন মনে হয়, অবৈধ উপায়ে অপার্জিত অর্থে জীবনকালে যে সন্তানের জন্মদান করি তার জন্মটা কী বৈধ?' এমন ভাবনা সচেতন তরুণের মস্তিষ্কে কিলবিল করতেই পারে। 'ঔপনিবেশিক মন, এই পারিভাষিক শব্দটি তাদের অস্তিত্ব খাবলে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তাই আত্মচেতনায় উজ্জীবিত তারুণ্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বাস করেও চিন্তার পরাধীনতা, চৈতন্যের মুক্তির অভাববোধ করছে। 'আমার মনে হয়, সব কিছুর পরও আমি নগ্ন হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি— ওরা আমার সম্ভ্রমও লুণ্ঠন করেছে!' বন্ধু বা কর্মিসমাবেশে তার সংস্থার সদস্যদের এমনভাবেই বুঝাতে চেষ্টা করে সুবিনয়। আজ সে প্রসঙ্গটা অন্যভাবে আরম্ভ করে—

দাদু আর আমি এই পুরনো ঘরটায় থাকি— তা প্রায় বছর কুড়ি তো হবেই। অবসর পেলেই দাদু তার শৈশব, দুরন্ত কৈশোর এবং ক্ষুরের মত ধারলো যৌবনের বিচিত্র সব গল্প শোনান। আমি অবাক, হতবাক; ভাবি— দাদুর যে বয়স তার যৌন ক্ষমতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কিন্তু অতিক্রান্ত জীবনের যে-অভিজ্ঞতা আরণ্যক অন্ধকার এবং চাঁদিমার পরতে পরতে চিত্রিত আঢাকা যুবতীর শারীর-চিত্রে তীব্র আলো ফেলে তার পিঠে বয়সের ছাপ নেই। সেই কৈশোর, এই বার্ধক্যের ভার ও অক্ষমতার দায় গ্রহণ করবে না, করবে না কোন শর্তেই। সেই যৌবন চিত্রাহরিণীর হৃদপিণ্ড দীর্ণ করে জ্যা-মুক্ত তীরে এবং এই বার্ধক্য তার কোন অন্তরায়ই নয়। ডবকা যুবতীর যৌবনের শটিবনে ঘাপটিমেরে থাকা চিতা বাঘটি দাদুর চেনা। জীবনের খানা-খন্দ কীভাবে টপকে সামনে ছুটতে হয় সব দাদুর জানা; মাঝে মধ্যে তার প্রশিক্ষণ চলে। আমাকে তিনি এমনভাবে গড়ে দিতে চান যাতে তাঁর ব্যর্থতার রাহু আমার জীবনটাকে গ্রাস না করে। তাঁর যৌবনবেদীতে দাঁড় করিয়ে তিনি যে সর্বক্ষণ আমাকে বিচার করেন তা বুঝি।

দৃষ্টিশক্তিহীন, শ্রবণরহিত এই মানুষটির জীবনচর্যা এই শিক্ষা দেয় যে, যৌবন জীবনকে সংসক্তির স্মৃতির খোলের ভিতর আমৃত্যু আটকে রাখে। প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষার কোষে কোষে, জাগতিক কর্মপ্রয়াসে যেমন সে

আপনার সার্থকতার বীজাঙ্কুর গজাতে দেখে পুলক শিহরণে ব্যাকুল হয়, তেমনি তার যৌন সম্পর্ক এবং তার পরিতৃপ্তির আলোক রেণু তাকে উদ্ভাসিত করে। পরোক্ষ পরিতৃপ্তি তার অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনর্জন্ম দান করে— এবার সে সঙ্গম-স্মৃতির দেয়াল আয়নায় নিজেকে আর একবার নগ্নরূপে আবিষ্কার করে। উদলা, চষাক্ষেতের মত উন্মুক্ত কাম-প্রকম্প যুবতীর উরুর ফাঁকে সমর্থ, সমভাবে উত্তেজিত চরমানন্দ অনুসন্ধিৎসু এক দক্ষ পুরুষ। কিন্তু সে অতীত— মৃত, তাতে জীবনের উত্তালতরঙ্গ কূলপ্লাবী হবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে আসে না। জীবনটাকে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে যৌবনের সেই প্রশস্ত নিকানো আঙ্গিনায় ফিরে যাওয়া যায় না— এই অসম্ভবকে মানুষ আজও অতিক্রম করতে পারেনি। দাদু নয় শুধু, দাদুর বয়সী যেকোন পুরুষই যৌন অক্ষম— এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় তাদের স্বাভাবিক অংশগ্রহণ ও আনন্দ উচ্ছল বয়ে চলা দেখে এমন বোধ হয় না-যে, জীবন তাদের-যে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছে তা নিয়ে কোন প্রকার ক্ষোভ, অভিমান আছে। আছে নিশ্চয়ই, থাকলে তা অতি অবশ্যই বার্ধক্যের খোলসে মোড়ানো। সত্যি সত্যি নেই কি? যা ছিল অথচ এখন নেই, তার অভাব চিরদিনই মানুষকে পুড়িয়েছে যন্ত্রণার তাতানো খোলায়। নিশ্চয়ই এ যন্ত্রণাও পোড়ায়, কিন্তু মানসিক সেই অতৃপ্তির যাতনা শারীরিক অক্ষমতার কাছে ফণার উপর দাঁড়াতে পারে না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাভব বড় করুণ ও মর্মস্পর্শী। দাদুর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া মুখমণ্ডল জীবনের নিষ্ঠুরতারই মূর্তরূপ বলে মনে হয়।

জগতের প্রবহমানতা এমনই থাকে মানুষটি সব কিছু রেখে হঠাৎ হাওয়া। দেহটা সৎকার নামক সামাজিক নিয়মে নষ্ট হয়, যে নামেই ডাকি, তার অস্তিত্বটা আর কখনও ফিরে না মূর্ত জগতের কেউ একজন হয়ে। দাদুও একদিন তাঁর বাবার মতো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে নক্ষত্রদের ঘরদোর পেরিয়ে, সহস্র ছায়াপথ অতিক্রম ক'রে ব্লাকহোল ছাড়িয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায়? কেউ জানে না। সুবিনয়ের একটাই কষ্ট যে, যখন দাদু বলে ডাক দিতে প্রচণ্ড ইচ্ছে করবে, আদুরে গলায় ডাক দিয়ে এসে এই ঘরের এই শয্যাটিতে কাউকেই পাবে না। কেউই আর উত্তর নেবে না 'দাদু, আসছে!' আমরা একই ঘরে থাকি — দুটি ভিন্ন বয়সের বোঝা কাঁধে, জীবন চাষ ক'রে যাচ্ছি দুজনেই। একই পরিণতির শিকার দুজনেই। অথচ একজন আকাশ দীর্ণ করে ছুটে যেতে প্রস্তুত, মহাজগতের সব কিছুতে তার অধিকার চায়। আর একজন ইতোমধ্যে জেনে গেছে ভয়াবহ শূন্যতা ও নিষ্ঠুরতার নামই জীবন। জনমের কোনোই অর্থ নেই! একজন যদি উত্তর মেরু অন্যজন দক্ষিণ মেরু।

দাদু আর আমার সম্পর্কটা এভাবেই বয়ে চলে খরস্রোতা নদীর প্রবাহ। জলবাহী স্রোতের দুই প্রান্তের আমরা দুজন দুটি তীর— কাছাকাছি, একে অপরের মুখে অপলক তাকিয়ে কিন্তু কেউ কারও আয়না নই। প্রচণ্ডশক্তিতে সকল বাঁধন দু হাতে ছিঁড়ে, সংস্কার-সম্পর্ক গুঁড়িয়ে একজন অপরজনের কাছে ছুটে যেতে সচেষ্ট নই কেউ-ই। অতীতের নাটমন্দিরে জোছনা নাচানো রাতের মধ্য প্রহরে কোনো ঘুঙুর পরা নৃত্যশীলা প্রতনু নারীর নিতম্ব দোলায় মুগ্ধ দাদু তার মসলিন উড়নির আঁচলের সঙ্গে আমার গাঁটছড়া বেঁধে দিতে চান। হঠাৎ কোনো এক অজানা ভয় ঝাঁপটে ধরে আমাকে; প্রাণপণ ছুটতে থাকি আমি। ছুটতে ছুটতে চলে আসি সেই জীর্ণ ভগ্নপ্রায় নাটমন্দিরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঝলমলে বহুতল ভবনের এক চোখধাঁধানো কক্ষে। অতঃপর ব্রা-বিকিনির স্বল্পায়তন খোড়লের ভিতর কাম থরথর নারীর থকথকে মাংসের প্রদর্শনী মঞ্চে একালের বলডান্সের আসরে দাদুকে টেনে নামাতে চাই আমি। সেখানে নারীরা সতী কিংবা সাবিত্রীর জীবন্ত বিগ্রহ নয়, তাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে ওঁদের জন্য কোনো আসনও নেই পাতা। সকলেই মেনকা, রম্ভা, উর্বশী! তারা গলিত স্তন উঁচিয়ে প্রেমিক শিকারে নামা ঘাইহরিণী। অর্থ-বিত্ত-খ্যাতির বাজারে তাদের বিকিকিনি একটা সময় পর্যন্ত বেশ জমজমাটই থাকে। তারা বিষয় বুদ্ধিতে এতটাই পাকা যে, ভাঙা পালঙ্ক যেমন সুদৃশ্য হলেও অধিক মূল্যে সকলেই কিনতে প্রস্তুত থাকে না— তেমনি নারীর সুরভিত যৌবন, যৌবনের সুরম্য নগরে বয়সের ঘুণ একবার ঘর বাঁধলে মহাজনের চোখে তা দেখে লোভের তারাবাতি আর জ্বলে না। পূর্ণমাসির চাঁদের শরীর গ্রহণ লেগে অন্ধকারের কষ্টিপাথরে পরিণত হয়। এই সব নারী সাপের জিবের মত লিকলিকে চিকচিকে চোখে শুদ্ধ স্বৈরিণীরূপে রাতের আসরে আসরে পানপাত্রের আদলে ঘোরে।

এ আর এক জগৎ। সংসারের সাধারণ হিসাব, নিয়মনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার বড় শিথিল এখানে। এই সব আসরে রাবারের অন্তর্বাস পরা টাইলস মোড়ানো নিতম্বিনীদের উন্মত্ত নৃত্যকালে আলো নিভে যায় হঠাৎ। তখন সেই অন্ধকার কক্ষে একসঙ্গে মা ও মেয়ের কামার্ত চোখে জোনাক জ্বলে কেবল, উদ্দেশ্যের আলোর জোনাকি। আসে শিকারির দল— মা, মেয়ে লোভনীয় মৌচাক। অভিন্ন প্রণয়ী তাদের— বাজি ধ'রে বাজিতে হারে দুই নারীর একজন, — যে জিতে তার বাজারমূল্য অধিক। যে কচি লাউডগা প্রথম মাচায় উঠবার অধিকার তার, এ বাজারে এটাই দস্তুর। অভিজ্ঞতা মাকে শিখিয়েছে এ বচন। অন্তরে ক্ষোভের বাষ্প জ'মে ঝড়ো মেঘের আকারে ঘনীভূত হয় না তাই। এ বাজারে ক্ষতির অঙ্কটা সচরাচর অপরিমেয়— দেহ যখন পুঁজি লোকসান তখন সময় গড়িয়ে যাবার নিয়মেই ঘটে। পুঁজি বৃদ্ধির জো নেই বলেই এখানকার কারবারিরা পতিত দশা প্রাপ্ত হয়। সে দশা অন্যের চেতনায় কখনও প্রভাব ফেলে এমন দেখা যায় না। তাই সব সময় এখানে ভিড় থাকে— নব যৌবনা থেকে বিগত যৌবনা সকলের তীর্থভূমি যেন এই পান ও নৃত্যশালা।

দাদু জানে না। বিত্ত-বৈভব-প্রতিপত্তির বাজারে নারী নয়া পণ্য— বহুমূল্যে বিকায়। বড় কোনো ব্যবসায়িক ড্রিল কিংবা রাজনৈতিক; প্রশাসনিক চুক্তি কিংবা দেশের বা জাতীয় স্বার্থ বিক্রয় হতে যাচ্ছে; কর্তার চোখে ছাই উড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে— অতএব একজন তন্বীর দেহের-আগুন চাই। এমন তীক্ষ্ণ ধার যে, দিকে দিকে সে রূপের আগুন জ্বালিয়ে নদী-সাগর, বন-প্রান্তর, ঘরদোর ভস্মীভূত করে দেবে। উজান থেকে ছড়িয়ে দেয়া যৌবনের অগ্নিছাই চোখের ভিতরে গিয়ে জ্বালা ধরাবে ভীষণ। এ জগতের খবর দাদুর জানা নেই। সময়ের অনেক পেছন থেকে হামাগুড়ি দিতে দিতে দাদু এই সময়ের নাভিদেশে এসে পৌছেছেন। সামন্তচিন্তার রক্ত প্রবাহ তাঁর মস্তিষ্কের শিরা-ধমনী পথে আজও তরঙ্গ তুলতে চায়।' মেখলা সুবিনয়ের পছন্দের মেয়ে নয়, তবু সবিনয় তাকে ভালোবাসে। তার খেয়ালের রঙিলা গুড্ডি উড়াবার জন্য মায়ের কাছ থেকে টাকা খসিয়ে আনে। রমনার কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার টুকরো টুকরো ক'রে মধ্যরাতে যে-যার গন্তব্যে ফিরে আসে। শরীর নিংড়ে দু'একবার জীবনের নোনা জলের স্বাদ গ্রহণও করে। কিন্তু ভালোবাসার লাশ দাফন করেছে তারা অনেক আগে। সহজাত প্রয়োজনটাকে এযুগে এমনই সহজিয়া ঢঙেই মেনে নিয়েছে— যারা মেনে নিয়েছে তারা তৃষ্ণার জলের দোষ দেখে শুধু, কুয়োর না নদীর জল সে' জাত দেখে না। পঁচিশ-সাতাশ বছর বয়স শুধু তীরে বসে জলের নর্তন, আস্ফালন দেখে কাটানো তো অভাবনীয় নিগ্রহ। তাই জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে এক আঁজলা জল নেয়া যেতেই পারে। একালে অনেকের আকাশে এমন যুক্তির তারা ফোটে ঘন সন্ধ্যায়।

দাদুর যৌবনে যুবতীগণ হয় কারও গৃহলক্ষ্মী, অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী— চার কি ছয় সন্তানের জননী। সে সময় সাত বছরের মেয়ের ঘাড়ে স্বামী নামক অচেনা অপ্রয়োজনের এক পুরুষকে চাপিয়ে দেয়া হত, যার বয়স কমপক্ষে আঠার। তারপর ধীরে ধীরে বালিকার মনের প্রান্তরজুড়ে স্বামী তার সনাতন বিশ্বাস-সংস্কার ও আধিপত্যের শিকড় ছড়িয়ে সমস্ত রস শোষণ অন্তে অন্য এক অস্তিত্বে পরিণত করে দিত। বালিকার কৈশোর লুণ্ঠিত হত স্বামী নামক পরপুরুষের দ্বারা। কারণ চেতনায় বিচারক্ষমতার উৎসারণের পর আত্মগত প্রেমের তাগিদে নির্বাচন নয়, অবোধ শৈশবের আনন্দ-আসর থেকে তুলে নিয়ে গাঁটছড়া আর মন্ত্রের দুর্বোধ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছে সমাজ, সংসার। সে নির্বাচন অন্যের দ্বারা প্রথাগত নিয়মে ঘটতো। যৌবন স্ফুরণের পূর্বেই অন্যের নির্বাচিত স্বামীটির অনিয়ন্ত্রিত উন্মত্ততার শিকার হত বালিকাবধূটি। ঘরে ঘরে সেই বালিকাবধূদের মানসিক যন্ত্রণার কি যে ভয়াবহ আর্তি ঘূর্ণনশীল বাতাসে উর্ধ্বগামী হতো তা উপলব্ধি করে মনটা কঁকিয়ে ওঠে সুবিনয়ের। কোনো নারীর মানসিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে তার শরীর গ্রহণ বলাৎকার হলে বলা যায়, বাংলার নারীগণ অসজ্ঞ রাতে তার শিকার হয়েছে এবং তা করেছে তাদের স্বামীদেবতারাই। এখনও কোনো কোনো স্বামী তাই করে, সঙ্গিনীর ইচ্ছের মূল্য না দিয়ে। সুবিনয় জানে, দাদু সেই নিয়মনীতির মঙ্গলময় দিকটি সম্পর্কে এখনও নিঃসংশয়। মাঝে মধ্যেই অস্তিত্বের অতল থেকে তার আর্তনাদতুল্য উক্তি ঝরে—

: সেকালের মেয়েদের স্বামীভক্তি আহা! কি বলব দাদু, মরে গেলেও স্বামীর নামটি পর্যন্ত মুখে আনত না। পতি পরম ধন, দেবতার নাম মুখে আনা যায় কিন্তু স্বামীর নাম নয়। স্বামী-যে নারীর দেবতা, তাই। স্বামীর নাম মুখে নিলে স্বামীর আয়ু কমে যায়, শাস্ত্রকথার বাইরে যাওয়া তো চলে

না। যত ব্রত-উপবাস সবই স্বামীর কল্যাণের জন্য, তার নাম মুখে নিয়ে তো এক আচরণের পাপে সব নষ্ট করতে পারে না। যে নারী স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়ে স্বামীর চিতায় উঠত তার অন্তরটা কত বিশাল বুঝে দেখ, কতটা ভালোবাসা থাকলে অন্যের জন্যে নিজের জীবন দেয়া যায়! আহা, সেইকাল কি আর ফিরবে? না...হ, কি যে সোনার দিন ছিল!

: নারীরা নিরক্ষর ছিল লোক শিক্ষার বাইরে তাদের কোনো শিক্ষারব্যবস্থা সমাজ করেনি— কেবল নিরবচ্ছিন্ন ভোগের উপকরণ রূপে ব্যবহার করেছে, জ্ঞানরাজ্যের দুয়ার তার জন্য বন্ধ ছিল। তাদেরকে তোমরা বুঝতেই দাও নি স্বামী দেবতা নয়, জীবন সঙ্গী। স্বামীর মৃত্যুর পরসমাজমৃতের স্ত্রীকে চিতায় তুলে দিতো তার সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্য, তার ভরণ-পোষণের দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য পরিবারের অন্য সকলে সে কাজে সহযোগিতা করতো। স্ত্রীকে সম্পত্তির ঊর্ধ্বে জ্ঞান করেনি বলে তাকে সম্পত্তির অধিকারও দেয় নি। সে' সমাজ একটা স্বার্থান্ধ সমাজ— অন্ধ সমাজ যুক্তিহীন অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে হেঁটেছে চিরকাল। রক্তের অণু-পরমাণুতে অবিচ্ছিন্ন হয়ে মিশে আছে সংস্কার-কুসংস্কার। হাজার হাজার বছর একই বৃত্তে ঘোরপাক খাচ্ছে কোনো সংস্কার, সংযোজন নেই, নেই কোন আবিষ্কার-উদঘাটন— অথৈ এক অন্ধকার অভিমুখে কিলবিল করে পিঁপড়ের মত দৌড়াচ্ছে সবাই। ধর্মের দাসে পরিণত হয়েছে জীবন— এমনটা কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেবল মরে যাবার জন্যই মানুষের মত সম্ভাবনাময় একটি প্রাণীর জন্ম হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় দাদু। মানুষ অবশ্যই একদিন মৃত্যুর গলায় ঘন্টি বাঁধবে— সেদিন গ্রহ-গ্রহান্তরে মানুষের অমরত্বের কীর্তিগাঁথা বিঘোষিত হবে নিশ্চয়ই। যদি সে'দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তোমার বোকামির জন্য কোনো সন্দেহ নেই আমি লজ্জিত হব।

: না, দাদু! ধরো মানুষের কোন ধর্ম নাই, কোথাও কোন দেশেই নাই, তা হইলে? মানুষগুলো বাধাহীন, বন্ধনশূন্য, বিধি-বিধান ছাড়া; মহারণ্যের প্রাণীদের মতো সর্বত্র চইরে বেড়াচ্ছে। সেই জীবনের কোনো সার্থকতা আছে? নাই। ধর্মহীন মানুষ আলগা পশু— এর ক্ষেতের ফসল নষ্ট কইরল, ওর ঘরে ঢুইকে তছনছ কইরল সব, তাকে গুঁতো মাইরল, সফরালীকে দিল লাথি, মুখ দিল রঞ্জন ঘোষের বউয়ের হাঁড়িতে, কচু খেতের সব কচু খাইয়া ফেইল্‌ল সুশীল মণ্ডলের, ইচ্ছে হইল তো মাঠ দিঘালী দৌড় দিল লেজ উঁচিয়ে। মানুষের লাগাম হইল তার ধর্ম— বেপথু চলা থেকে মানুষকে রক্ষা করে আর সকল হীনকর্ম থেইকে তাকে বিরত রাখে ধর্ম। গাছের শিকড়ের রসই তার পাতাগুলোকে বাঁচাইয়ে রাখে এ তো আর মিথ্যে নয় দাদু! ধর্ম হল, জীবনের রস!

: তোমার কথা মানা যায় না দাদু! পশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাকে যতটা নিয়ন্ত্রণ করে ধর্ম মানুষকে ততটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। মন্দিরে অসংখ্য সেবাদাসীর সম্ভ্রমহানি ঘটেছে পুরোহিতের দ্বারা। ধার্মিক পুরুষ পরস্ত্রী অপহরণ ও অন্যের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করেছে ঢের। কোন ধর্মই মানুষের ধনলিপ্সা ও অতৃপ্ত যৌনকামনার নিবৃত্তি ঘটাতে পারেনি। নিবিড় অনুসন্ধানে পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল যেকোন ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারীদের জীবনের পাতায় পাতায় অপকীর্তির যে তালিকা পাওয়া যাবে তা ধর্মের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। সকল ধর্মের আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার যে-প্রেক্ষাপট তাতে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, ধর্মগুলো স্ব স্ব সমাজের অবিকশিত স্তরে সমাজ মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। যুক্তিনির্ভর জ্ঞান নয় বলেই তা বিশ্বাস-ভূমিতে আপন আপন শিকড় গেড়ে বসে, তাই সে আজ সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তার আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা। রসটা ওখানেই— সামাজিক উৎসব, আনুষ্ঠানিকতায়। না হলে ঐ রসটা শুকিয়ে কোন্ কালেই কাঠ হয়ে যেত! 'আকস্মিকভাবে নীরব হয়ে যান দাদু। ইদানিং মনে কষ্ট পেলে ওভাবেই তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁর শতবর্ষজীবী বিশ্বাস আহত হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতে। রক্ত ঝরছে ক্ষত স্থান থেকে— বেদনার নির্দয় দংশন তাঁর অস্তিত্বে ফেলেছে দীর্ঘ ঘন ছায়া, মূর্চ্ছিত ছায়া— জোসনা রাতে বাড়ির দক্ষিণ কোণের ছাতিম গাছটার ছায়া পড়ে যেমন সমস্ত উঠানে, ঠিক তেমন। হরিদ্রাভ মুখমণ্ডলে ছাই রঙের প্রলেপটা বেশ সজীব ও স্থির; উজ্জ্বলও খানিকটা। দাদু নিস্পন্দ। ছাদের দিকে নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে কি যেনো ভাবছেন দাদু। সমাহিত দাদুকে দূরের নক্ষত্রের সমগোত্রীয় মনে হয়। মধ্যরাতের আকাশের নীলজমিন পেরিয়ে দূরতর নক্ষত্রের উত্তাপ

দুধের ভারে। সে এখন বয়সের গুণটেনে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে মধ্য দুপুর থেকে সন্ধ্যার আলোহীন দিগন্তাভিমুখে। মাছরাঙাটিও ঝুপ করে ডুব দেয় গভীর জলে— তারপর হারায়, অচেনা সেই পথে যেতে যেতে মিলিয়ে যায় অচিন দূরে।

এক একটা বুদ্‌বুদ সময়ের তাল ঠিক রেখে ওঠে। এক এক চরিত্র তাদের, কোনোটি প্রবল ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরশাসকের মতো কুঁড়ে কুঁড়ে খাবলে খায়। মনটাই সম্ভবত মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু— আজকাল প্রায়ই সুবিনয়ের তা'ই মনে হয়। মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে থাকা অজুত ভাবনা উধাও হলে দুর্ঘটনায় সন্তান হারানোর পর প্রঘাতে বাকশক্তি রহিত পিতার মত অমেয় যন্ত্রণায় ছটফট করে। অনুসন্ধানে জগতে দুর্লভ অনেক বস্তুর সাক্ষাৎ মেলে হয়তো কিন্তু হারানো ভাবনাদের ছায়া-কায়ার হদিস মিলেছে কখনও এমন শোনা যায়নি, শোনেনি কেউ। মন ভাবনা শূন্য হওয়ামাত্র— শত, সহস্র নতুন ভাবনা এসে সেই শূন্যস্থান সবলে দখলে নেয়। আধিপত্যবাদী নতুন ভাবনারা পুরনো ভাবনাদের উপর অকথ্য উৎপীড়নের দ্বারা আপন আধিপত্য কায়েম করে— তাই তো হারালে আর খুঁজে পাওয়া যায় না ভাবনাদের। সুবিনয় আধিপত্যবাদী নতুন এক ভাবনার পেষণ দণ্ডের নিচে পিষ্ট হতে থাকে। দাদুর নিজের পৃথিবীতে গুপ্তচরের বেশে ঢুকে পড়তে চায় সে। নিশ্চয়ই সেখানে অদৃশ্য সব অট্টালিকায় নগর পরিপূর্ণ।

বাতাসের দেয়াল, জোসনার ছাদ, আলোর জানালা, পাপড়ির পালঙ্ক, জলের শয্যা চমৎকার সজ্জিত সব বাড়ি। সেখানে সোনার আলনা থেকে মাকড়সার আঁশে বোনা হীরা বসানো শাড়ি তুলে নিয়ে স্বর্ণ চাঁপার শরীরে পরে ষোড়শী নারীগণ। তাদের দীঘল কেশ বাঘের দাঁতের চিরুণীর আঁচড়ে ফুলে ওঠে গোক্ষুরের ফণায়। সেই সব নারীদের কাঁঠালি চাঁপা স্তনে শঙ্খের সুষমা। নাভিতে নিরুত্তাপ সূর্য জ্বলে। সঙ্গমকালে তাদের যোনিদেশ থেকে উত্থিত হয় বকুল-হেনা-জুঁই-গন্ধরাজের মিলিত সৌরভ। সেই পৃথিবীর পুরুষগুলো আরবি তেজি ঘোড়া। গতি আর শক্তির যুগল সম্মিলনে তারা নায়েগ্রা জলপ্রপাত। নখে নখ ঘষে বিদ্যুৎঝড় তোলে ভূধর অন্তরিক্ষে। তারা শিশ্নডগায় গাঁথে উন্মত্তা নদীর খরস্রোত। বিচিত্রনামা পাখিরা সেখানে আঙুরের মত ঝুলে লতার স্তনে, চিত্রাহরিণেরা দুধের ধারায় ভিজায় গোলাপ বাগান। শ্রমবিহীন ভোগ ও সুখের আতিশয্যে সে জগৎ উদ্ভাসিত। সে নগর রক্ষার দায়িত্বে আছেন শক্তিধর এক দেবতা। তার নদীগুলোর প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখতে সর্বদা সক্রিয় রয়েছেন আর এক দেবতা। কাম ও প্রেম সেখানে জৈবিক ক্রিয়ার অংশ নয় তা দেবদেবীর নিয়ন্ত্রণে, তাদেরই ইচ্ছার অধীন। জাগতিক জ্ঞানের অরণ্যে কোটি কোটি বৃক্ষ-লতা, ফুল-ফল, শিকড়-বাকড় তাতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা তার নিজের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়, দেবতা তুষ্ট হলে তবেই মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানের সূক্ষ্ম কণাকণিকাগুলো প্রবেশ করতে পারে। রোগ-ব্যাধি, ধন-সম্পদ, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, শস্য-সম্পদ সবকিছুর জন্য রয়েছে আলাদা, আলাদা দেবদেবী। সুবিনয় সে জগতের কেউ নয়, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার চাকরি ও শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ তাকে ভিন্ন পথে ঠেলে দিয়েছে আপন শক্তিতে। কল্পনা নয়, দুঃখঘেরা বাস্তব পৃথিবীর মানব-মানবীর দুঃখের গঙ্গা; কষ্টের পদ্মা, তিস্তার যৌথ প্রবাহে ছিন্নভিন্ন জীবনের তল খোঁজাই সে' সংস্থার উদ্দেশ্য। আলো দিতে হবে তাদের অন্ধ চোখে, অন্ন দিতে হবে মুখে। অন্ন নয় ঠিক, তা জোগাড় করবার, উৎপাদন করবার উপায় দেখাতে হবে— সেটাই আলো। অন্যের আলোয় মানুষ কতোটা পথ দেখতে পায় তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে সুবিনয়ের মনে। প্রশ্ন যতোই থাকুক দাদু থাকে সবটা সময় ধরে— আজকাল অবশ্য মেখলাও একটা বুদ্‌বুদ। অপছন্দের যৌবনসঙ্গী। কেউ না থাকার মুহূর্তে কেউ একজন থাকা!

দাদুর পৃথিবীর রঙমহলে সুবিনয় প্রবেশ করে মধ্যরাতে। নির্জন রাতের উঠান, খিড়কি দুয়ার, অন্তঃপুর সর্বত্র ঘুরে অচঞ্চল চিত্তে সে ছিঁড়ে এক একটা রহস্যের ইন্দ্রজাল। দাদুর প্রশান্তির রহস্য তবে এখানে? কঠোর শ্রমে নিজেকে গলিয়ে জল করে দিয়ে যে অর্জন তাকে দাদু বলেন দেবতার অর্জন। নিজ জীবনের সকল দায় দেবতার উপর চাপিয়ে দিনরাত্রির কঠোর শ্রমে, শক্তির অকল্পনীয় অপচয় করেও মনে অবিচল বিশ্বাস সব কিছু তিনিই দিয়েছেন, আরাধ্য দেবতা। কি মজা, সকল জ্বালা জুড়াবার মন্ত্র, মহৌষধ! নিজকে সমর্পণের এই ভঙ্গি ও কায়দা একেবারেই এদেশের নিজস্ব। এর অভ্যন্তরে যে দর্শন তা মাধুর্যে সুস্নিগ্ধ। নিজের কষ্টার্জিত

> দাদু জানে না। বিত্ত-বৈভব-প্রতিপত্তির বাজারে নারী নয়া পণ্য— বহুমূল্যে বিকায়। বড় কোনো ব্যবসায়িক ড্রিল কিংবা রাজনৈতিক; প্রশাসনিক চুক্তি কিংবা দেশের বা জাতীয় স্বার্থ বিক্রয় হতে যাচ্ছে; কর্তার চোখে ছাই উড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে— অতএব একজন তন্বীর দেহের-আগুন চাই। এমন তীক্ষ্ণ ধার যে, দিকে দিকে সে রূপের আগুন জ্বালিয়ে নদী-সাগর, বন-প্রান্তর, ঘরদোর ভস্মীভূত করে দেবে। উজান থেকে ছড়িয়ে দেয়া যৌবনের অগ্নিছাই চোখের ভিতরে গিয়ে জ্বালা ধরাবে ভীষণ

সাফল্যের ষোলআনা কৃতিত্ব অন্যকে সমর্পণ করবার জন্য মনের যে-প্রশস্ততা প্রয়োজন তাতে এদেশের মানুষ সব চাইতে ধনী, এর তুল্য আর কেউ নেই কোথাও। অন্তত সুবিনয়ের তাই ধারণা। জগতের সমস্ত মায়ার বন্ধনে নিজকে আবদ্ধ রেখেও মানুষগুলো কেমন বন্ধনহীন— সহজেই এরা তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে ভিন্ন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে খুব সহজে সব কিছু ত্যাগ করতে পারে অবলীলায়। এমন কি নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ভারতীয় দর্শনের দুঃখের জায়গা এটাই, প্রশান্তির জায়গাও এটাই— যে, যে-পথে যায়!

প্রকৃতির অন্তর্গত এক একটা শক্তির স্বরূপ দূর প্রাচীন কালেই এদেশের মানুষ আবিষ্কার করে— কিন্তু সেগুলোকে বিজ্ঞানের কারখানায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রয়োজনের আয়তনে সীমাবদ্ধ না করে ঠাঁই দিয়েছে আপনার অন্তরে। আধ্যাত্মিক মুক্তির নিয়ামক করেছে দেব, দেবীর আসনে বসিয়ে। কি নির্বুদ্ধিতা! রাতের প্রহর সময়ের পাহাড় পেরিয়ে ভোরের আলোর সাগরে হারায়। আমার চোখের শাখায় পাতায় কোথাও ঘুম নামে না। দাদুর মনের শিকড় বাহিত রস কোন্ উৎস বিন্দু থেকে উৎসারিত তার ঠিকানা পেয়েছি আমি। কিন্তু পথ বড় দুর্গম। আরও গভীরে প্রবেশ করা চাই, আরও সূক্ষ্ম স্তরে। দেবীকে মায়ের আসনে বসিয়ে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে কিন্তু দেবতাদের মধ্যে পিতার আসন দিয়েছে মাত্র একজনকে। তিনি বাবা ভোলানাথ, দেবাদিদেব মহাদেব —কেন? এর পেছনে সমাজতাত্ত্বিক কোনো গূঢ় রহস্য রয়েছে নিশ্চয়ই। এই পিতার সামাজিক পরিচয় অভিজাত ব্রাহ্মণ সমাজে শূদ্রের চেয়ে অধিক মর্যাদার নয়। সুবিনয় ভাবে, 'দেবতাকে এতটা হীন রূপে উপস্থাপন করবার বৈদিক ষড়যন্ত্রের কারণ একটা অবশ্যই রয়েছে সেটা জানা জরুরি। পাথরের অন্তর্গত কণাগুলোরও প্রাণ আছে, তা না থাকলে কণাদের অভ্যন্তরীণ বন্ধন টুটে যেত, পাথরের অস্তিত্ব বিনষ্ট হত সম্পূর্ণত। ধর্মের উদ্দেশ্য যাই থাক সমাজের বন্ধন অটুট রাখতে তার প্রয়োজনও একই রকম। বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের অশান্তির মর্মে ধর্ম-সম্প্রদায়গত বিরোধই আবহমানকাল থেকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। সুবিনয় ইতিহাসের পাতায়-পৃষ্ঠায় তার অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছে। দৃশ্যমান নয়, অথচ অস্তিত্বশীল এমন এক অক্ষয় অনিন্দ্য জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাস-ফাঁদে ফেলে ধর্ম মানুষকে দাসত্বের বেড়ি পরিয়েছে। কেবল বিশ্বাসের পুঁজিতে যা ক্রয় করা যায় তাই ধর্ম— অবিশ্বাসীর ধর্ম নেই। তাই, অস্তিত্ব থাক বা না থাক মানুষ

যেমন এসে পৌঁছে না পৃথিবীর নিবসনা বুকের সুষমায়, — দাদুর ভাবনারাও অনুরূপ দূর থেকে টকটকে রঙ ছড়ায় কিন্তু অন্তর্গত অস্তিত্বের ঘূর্ণিনাচন তোলে না প্রবল শক্তিতে। দাদু কী তবে আমার যুক্তিগুলোকে অপক্ক বয়সের অহেতুক বাড়াবাড়ি মনে করে কষ্ট পাচ্ছেন?' সুবিনয় ভাবে। ভাবনাগুলো তার প্রান্তরের বুক ধরে ছুটে চলা সরু পথে যেতে যেতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় কালিয়ার পুকুরে এক ডুবে মাছ ধরে নিয়ে উড়ে যাওয়া মাছরাঙাটার মতো।

সুবিনয়ের সমস্ত শৈশবজুড়ে সেই ফিরোজা রঙের কালো লম্বা ঠোঁটের মাছরাঙাটা ঢেউয়ের বিস্তারের ভঙ্গিতে সুরঙ্গী ডেকে যেতো। কোনো কোনো নিথর দুপুর তার সবলে দখল করে নিত একটা তিলাঘুঘু। বিরহিণীর শূন্য হৃদয়ের যন্ত্রণার মতো তার নিরবচ্ছিন্ন ডেকে যাওয়ার মুহূর্তগুলো সুবিনয়কে ধারালো ক্ষুরে কেটে ফালি ফালি করতো। ঐ সময়গুলোতে ওর কেবলই মনে হতো বুকের ভিতর থেকে কোনো নির্দয় অনভিজ্ঞ কসাই বুঝি যেন-তেন প্রকারে অনেকটুকু মাংস কেটে নিয়ে গেছে। নিঃসঙ্গতার অগ্নিময় বিষাক্ত ঝড় ওকে উদবাস্ত করত এক নিমেষে। তারপর সমস্ত বিকাল নিরাকুল সুবিনয় এখানে ওখানে ঘুরে অবশেষে কালিয়ার পুকুর পাড়ের বিশালাকার জয়না গাছটার নিজে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে যেতো। এক সময় তারও পর, পুকুরের গায় কচুরি-চাদরের ফাঁকে ফাঁকে বৃত্তাকার ঘন কাল জলের উঠান মতো স্থানে পানি পোকাদের লীলালাস্য আর দেহ বিনিময় দৃশ্য দেখে দেখে শূন্য হতে হতে হারিয়ে ফুরিয়ে যেতো সে। কখনও নিজকে প্রায় অস্তিত্বহীন মনে হলে সে পুকুরের কোণে বাঁশঝাড়ের পাশের হিজল গাছের মড়া ডালটায় বসে থাকা প্রিয় সেই মাছরাঙাটির দিকে তাকিয়ে তার একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হতো। বার বার ব্যর্থ হয়েও মাছরাঙাটি জলের শরীর কেটে সাঁতরাতে থাকা ছোট ছোট মাছগুলোকে লক্ষ্য করে ডুব দেয়। তারপর এক সময় দু কি তিনটি মাছ খাওয়া হলেই ছোট্ট ডানায় হাওয়া লাগিয়ে সুবিনয়ের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতো। সুবিনয় অনেক দিন চেষ্টা করেছে মাছরাঙাটির বাড়ি কোথায় কোন্ চুলায় সে যায় তা দেখবার জন্যে। কিন্তু পারেনি, যেতে যেতে সে হঠাৎ করেই কোথায় যে হারিয়ে যেত সুবিনয় সেটা কোনো দিন বুঝতে পারেনি।

আজ বুঝতে পারে। পাখিটা যে তার আপন নিবাসে ফিরে যেতো বলে মনে হতো আসলে তা নয়— সে যেতো, যেতে থাকতো যে-পথ সুবিনয়ের চেনা জানার বাইরে, সেইখানে। অজানার কুমারিত্ব হরণ করার মধ্যে খুঁজে পেতো অপার আনন্দ। হয়তো আর ফিরেই আসতো না এইখানে সুবিনয়ের এই বৃত্তাবদ্ধ জীবনের চারপাশে পুরনো পরিচিত ভুবনে! কোথায় সে দেশ মাছরাঙাদের অভয়ারণ্য? সেখানে নদীরা কথা কয় অহর্নিশ। কেউ তাদের জলের কবর রচনা করে না মাটির স্তরের পর স্তর সৃষ্টি করে। মাছেরা কখনও হয়তো উড়ে! আকাশটা হয়তো বুকে নিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে নৃত্য করা যায়। জীবন হয়তো কোনো দিনই মরে না; দাদু পুরনো হতে হতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝ'রে মাটির সাথে নিষ্ঠুরভাবে মিশে যায় না। সুবিনয়ের মন সকল সময়ই যেখানে উড়ে যেতে চায়। সেখানে হয়তো মেখলারা অন্যরকম, প্রজাপতি, গঙ্গা ফড়িং কিংবা সুগন্ধী ঘাসফুল।

হয়তো সেখানে মৈত্র বাড়ির ভানু সোনার ময়নার বেশে রোজ আসে মাছরাঙাদের মেলায়। আসে সে তিন প্যাঁচে শাড়ি পরে ঢেউয়ের মত। তারপর লাউয়াদের মেয়ের কাছ থেকে বেলোয়ারি চুড়ি কিনে লাল, কমলা, সবুজ, নীল, খয়েরি অনেক ডজন। আশ্চর্য চোখ তার, সুবিনয় দেখেছে লাটিমের মত ঘোরে অথচ সুন্দর গোল, আকৃতিতে বড় কুলের মত চোখের মণি। সেখানে ঝড় ফুলে ওঠে, নেচে উঠেই দৌড়াতে থাকে। সেখানে আগুন জ্বলে, অভাবনীয় আলোর চকমকি আর তীব্র দহন ক্ষমতা চমকে দেয়। সেখানে বিশ্বাস রঙ বদলাতে বদলাতে অবিশ্বাসের ঘরে প্রবেশ করেই ফিরে আসে। সেখানে প্রেম বিচঞ্চল : টুকি দিয়েই আড়ালে মুখ ঢাকে, ফিক করে হাসে আবার পলায়। সুবিনয়ের কৈশোর মাত্র একটা গুলতির মধ্যে গেঁথে আছে। একটা নির্জন আমবাগানজুড়ে ছড়িয়ে থাকা দুপুরের শরীর কেটে কেটে বসানো। কি ভয়াবহ একাকিত্ব। দুপুরটা ঘুমাতো, মা ঘুমাতো, বাবার চাকরি, দাদুর ঘুম— কেউ নেই কোথাও! দুপুরের আকাশটা পর্যন্ত অজানার উচ্চতায় যেতো হারিয়ে। তা ভানুর জোসনার মত ত্বকে, স্তনের কুঁড়ির উচ্চতা ও স্ফিতির সুষমায় উবু হয়ে পড়ে আছে থাকতো।

ভানু দমকা হাসির গমকের ভিতর এক লুপ্ত চৈতন্য। যতোবার হাসে ততবার এক হাজার একশত কাচের গ্লাস এক সাথে ঝনাৎ ভাঙে। সে দুপুর এখন মৈত্রদের মেয়ে ভানুর বাম উরুর মাঝখানের কাটা দাগের সেলাইয়ের ফোঁড়ের মধ্যে সংগুপ্ত। তাকে আর কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেলাইটাও মিশে গেছে উরুর সাথে। সময়ের গাঢ় পলির আস্তরণ পড়ে পড়ে মনের গহীনে চাপা পড়া সুবিনয়কে সেও আর দেখতে পায় না। তার বয়সের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী স্বামী আজ বেঁচে আছে কি নেই তাও জানা যায় না। জানতে গেলে গলা বাড়িয়ে আসবে সমাজ— যার কোনো অধিকারই নেই, ভানু আর সুবিনয়ের ব্যাপারে নাক গলাবার! হয়তো, এতোদিনে ভারী ফ্রেমের ছকে বাঁধা উচ্চ শক্তির গ্লাসের ভিতর থেকে পিট পিট করে তাকায় ভানু মৈত্রগুপ্ত। দু-খান দাঁত খসিয়ে নিয়েছে কালের দাপট। এখন সে মৃত বাঙালি নদী, সেদিনের সেই প্রমত্তা পদ্মার মতো ভানু! ভানু মৈত্র এলেই বিকেলের ঝোপ থেকে মাছরাঙাটা অদৃশ্য হত খুব নীরবে কিছু না বলেই, ফুলের শরীর থেকে গন্ধ ঝরার নিয়মে সে অদৃশ্য হত। প্রচণ্ড ঈর্ষা ও অভিমানে একদিন ভানু মৈত্র জানতে চেয়েছিল—

: আচ্ছা, আমি এলেই তুমি মাছরাঙাটাকে খোঁজ কর কেনো? রোজ ওর সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন? সুবিনয় কখনও ভাবেনি এ প্রশ্নের উত্তরও তাকে দিতে হবে কিংবা দিতে হতে পারে কোনো দিন। অতএব উত্তরও তৈরি ছিল না — তাই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ভাবতে হল তাকে। বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ কাটলো। তন্ময় সুবিনয় দ্বিতীয় প্রশ্নের ধাক্কায় ব্রেককষা গাড়ির অন্যমনষ্ক যাত্রীর মত ঝুঁকে প'ড়ে সচেতন হয়। অতঃপর অনেক হিসাব কষে উত্তর দেয়—

: তুমি এলেই পাখিটা চলে যায় যে! রোজই এই ঘটনা ঘটে, তুমি এলে তাই ব্যাকুল হয়ে পাখিটাকে খুঁজি। কেনো সে চলে যায় তা জানবার জন্য খুঁতে থাকি। সে কেনো ঈর্ষা করে তোমাকে? সত্যি কি? আমি জানি না। কোনো দিন পেলে তোমাকে দেখাতাম অদ্ভুত সুন্দর সে। পাখিটা ওরকম কেন করে ভাবি, তুমি এলেই ও চলে যায়, তুমি যখন থাকনা সে থাকে! আশ্চর্য! আজ ভানু মৈত্র মৃত— সে একটা সময়ের প্রতীক। সে আমার অতীত জীবনের এক অলিখিত অধ্যায়ের ইতিহাস। যে কাল আর কখনও সম্মুখে আসবে না, —যে সময়গুলো ফসিলের ভিতর নিথর নিশ্চুপ তার মধ্যে ভানু আছে— বয়সের সেই বিন্দুটি আর কখনও সরেনি এতটুকু। ভানুর সেই সুরভিত শরীর, বুকের সুগন্ধ বেলির নির্বাস, তরঙ্গ-বিভঙ্গে চলার গতি কিছুই বদলায়নি, সবই আছে ওর মধ্যে— ঐ এক টুকরা অতীতের জাদুঘরে চেতনার সোনার পিঞ্জরে। আমি ফুরিয়ে নিঃশেষ হচ্ছি ধূপের মত— সেও তাই। আমার চারদিকের জীবন ঘিরে অবিরাম চলছে সময়ের খেমটা নাচন— বিসংগত আলোড়ন জগতের নাভিকুণ্ড হতে পাকিয়ে উঠে জীবনের বিনাশ সাধন করছে প্রতি মুহূর্তে। বিপুল শক্তিধর সেই সময়-রাক্ষস আমাকে সজোরে টেনে নিচ্ছে ঘনঘোর অন্ধকার তার পেটের ভিতর। হয়তো এই গ্রহেরই অন্য প্রান্তে কোনো এক জঞ্জালপূর্ণ সংসার-নলখাগড়ায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে ভানু মৈত্র। আমার দুরন্ত কৈশোর বাঁধা ছিল তার কোমরের খাঁজে— এখন কোনো গুরুতর বিপদেও ডাক আসে না ভানুর। অথচ একদিন শরীরে শ্রাবণ নামলেও আমাকে জানাতে হতো তার। ডেকে বলত,—

: মনে হয় আমি মইরে যাবো, রাত থেকে রক্তে ভাইস্তাছি, —কি যে কষ্ট! সুবিনয়! আমার হইয়া এই কষ্টটা তুমি কইরতে পারো না? আমি উত্তর দেই—

: আরে দুর! এইটাও সম্ভব? না না, কোনো কারণে আমার কষ্ট হলে তা যে তোমারও হয় সেটা মানি, বুঝতেও পারি। কিন্তু ওটা অইবো ক্যামনে!

: সেইটাই কী ভালো ছিল না? আমার সুখগুলা কোটিগুণ বেশি হইয়া তোমার অইবো; তোমার কষ্ট সহস্র কোটিগুণ বেশি হইয়া তা আমাকে পীড়ন করবে। আমি তো তাই চাই।

এখন ভানুর জন্য আমার অন্তর কান্দে, রাতে ঘুমের অন্তঃপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র প্রায়ই মেলে না। অথচ ভানু কোনো খবরই জানে না আমার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভানু মৈত্র আজও আমার চেতনায় সেই মাছরাঙা। তার বয়স সেই কৈশোরের উদাস প্রান্তরে প্রজাপতি, গঙ্গা ফড়িংয়ের হাটে, ফুলেদের মেলায়, মাছরাঙাটির ফিরোজা আঁচলের গিঁটে স্থির। বয়স বাড়ে অন্য এক ভানুর, কোনো এক অচেনা পুরুষের নিষিক্ত শুক্রকীট যে, আপনার ডিম্বাণুতে ধারণ অন্তে রক্ত-ওম-উত্তাপে মানুষে পরিণত করে। আজ তার তলপেট মাতৃত্বের চিহ্নবাহী। স্তনের শৃঙ্গ নুয়ে পড়েছে ধবল

সেই অমূর্ত জগতের দিকে ধাবমান। বিশ্বাসের দ্বারা সৃষ্ট প্রাচীন পিরামিড কিংবা শ্রাবস্তী।

দৃশ্যমান জগতের ভিতর দিয়ে সেই মায়াময় অদৃশ্যলোকে প্রবেশ করে তার বস্তুগত অবস্থান ও উপাদানগুলোর পরীক্ষার ফল হাতের তালুতে নিয়ে দেখতে চায় মহাজ্ঞানের রূপটি কি। জীবনের কণাকণিকার রাসায়নিক উপাদানগুলো যদি সেই জগতের বস্তুরাজির অন্তর্গত অস্তিত্বের সঙ্গে মিলে যায় তবে একটা সত্য নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে। দেবী মায়েদের পরিচয়টা তখন আর একটা মাত্রা পাবে হয়তো।

সুবিনয়ের চেতনায় এ সকল চিন্তার অনেকগুলো জটিল স্তর তৈরি হয় —মৃত্তিকার অসংখ্য ভাঁজের মত সে সব স্তর। মাইটাল যেমন মাটির স্তর কেটে কেটে ঘর্মাক্ত পরিশ্রান্ত হলেও সজোরে কোদাল চালায় কঠিন মাটির স্তরে সুবিনয়ও তেমনি প্রবল শক্তিতে চিন্তার এক একটা স্তর কেটে কেটে এগোয় একাকী। মানুষ দিনে দিনে জীবনকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। এক যুগের ভাবনা আদর্শ অন্য যুগে অচল। মানুষের চোখে অন্য ভাষা — আত্মপরতায় তা অধিকতর জান্তব। ব্যক্ত ঈশ্বরগণ সংসারকে ইচ্ছের বাসনা কামনা পূরণের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তাই অন্যের জন্য কোনো জায়গা নেই, তাদের আকাশ থেকে সহানুভূতির শিশির ঝরে না এক বিন্দু। বাতাসও হত্যা করেছে তারা, জল তো কবেই গেছে মরে। কি চায় মানুষ? হৃদয়ের দীপ জ্বালার পরিবর্তে দেহের প্রদীপে ঘি ঢেলে বসে থাকে আসরে আসরে। গুপ্ত ঈশ্বর যেনো অদৃশ্য হচ্ছে আরও সুদূর অজ্ঞাত ভুবনে। আরও দুঃসহ তাপপ্রবাহের পরে প্রচণ্ড গতির হিম প্রবাহ আছে। আরও আরও সময় যাবে মানুষের রক্ত-সুপ পান ক'রে তালু টাকরাবে মানুষ। নৃত্য-সংগীতের সাথে ড্রামের তালে তালে বারবিকিউ হবে শিশুর কচি মাংসে। উন্মাতাল নৃত্যের আসরেই কোনো নারী খসাবে তার অপুষ্ট ভ্রূণ। হয়তো সে' ক্ষরিত লালাময় রক্তও কারও কাছে সুপেয় পানীয়ের মর্যাদায় গৃহীত হবে। প্রেম ও ভক্তিশূন্য আমাদের সময় সে' অনাগত কালের নিশান উড়িয়ে দিয়েছে আকাশে আকাশে। 'এই সব ভেবে ভেবে কেবল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। আমরা সকলেই এখন আত্মপ্রেমে আত্মরতিতে নিমগ্ন। তাই আমি ভালো না বেসেও মেখলার সঙ্গে থাকি— সেও হয়তো সমকামে পরিতৃপ্তি পায় অধিক। তাই এড়িয়ে যায় পুরুষ সঙ্গীটিকে!' সবিনয়, তার সময়টাকে এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত।

মাঝে অনেক দিন দাদুর কাছে বসা হয়নি। বিনুরও ব্যস্ততা বেড়েছে ঢের। সেও নিয়মিত বসতে পারে না। দাদুর একাকী জীবন যে, কি কষ্টে কাটছে তা অনুমান করতে পারি। এখানে সম্প্রতি 'বিশ্ব জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুবিনয় তার সদস্য। এর সদস্য সংখ্যা বাড়ানো, অর্থের জোগান দেয়া, সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় করা কত শত কাজ। এ ছাড়া বিশ্বের সর্বত্র প্রতিদিন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অর্জিত হচ্ছে প্রভূত জ্ঞান। সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডারে নিত্য সঞ্চিত সেই সব জ্ঞান সংস্থার সদস্যদের জন্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পাঠ-বিশ্লেষণ নানান কাজ। ইদানিং সময়ের খরচ বেড়েছে ঢের— সঞ্চয় নেই একেবারেই। তাই সময় হয় না দাদুর কাছে বসবার, মেখলার সঙ্গেও-যে নিয়মিত দেখা কিংবা কথা হয় এমন নয়। রাতে হঠাৎ দাদু এসে বসে আমার বিছানায়, আমাকে অনেক দিন কাছে না পেয়ে অস্থির তিনি। প্রতি রাতে এ সময় তিনি ঘুমের সাগর পারি দিতে থাকেন, আজ ঘুম পরাজিত হয়েছে তাঁর কাছে। ব্যাপারটা প্রথমবারই ঘটল। এই অঘটনটা ঘটবার কারণ কথার পাহাড়ের নিচে চাপা পড়তে পড়তে দাদু কোনক্রমে এখানে এসে পৌঁছেছেন। মনের ভিতর কথারা কিলবিল করছে আবর্জনার কীটের মত। সহ্য করতে না পেরে দাদু পিঁপিলিকার মতো শব্দগুলো বের করতে থাকেন মস্তিষ্কের কোষ-গর্ত থেকে—

: দাদু ভাই! আমেরিকা ইরাকের দখল ছাইড়ে দিচ্ছে খবরটা শুইনে স্বস্তি পাচ্ছি মনে। নিজের অর্থ খরচ কইরল সৈন্য দিয়া যুদ্ধ করল, দখল নিয়া তারপর সে দ্যাশ ছাইড়ে দেয়া কম কথা নয়! তুর্কিরা ফিরা যায় নাই, মুঘলরা যায় নাই— তারা এদেশেই আছিল। ওরা না থাকলে কি অবস্থার ভিতর দিয়া আইগাইতো এই দ্যাশ, সে অবস্থা আজ অনুমানও করা যায় না। যাই বলো একটা আস্ত দ্যাশ দখলে নিয়া ছাইড়ে দেয়া! উদ্দেশ্যটা ভালই বইলতে হবে। সাদ্দাম বাড়াবাড়ি না কইরলে হয়তো যুদ্ধটাই হইত না! আমেরিকা তো শেষ পর্যন্ত তাই প্রমাণ কইরল যে, তার যুদ্ধটা ছিল নিঃস্বার্থ। দাদুর সরল বিশ্লেষণ সুবিনয়ের অভিজ্ঞতায় নতুন সংযোজন। সে ধরে নেয় গড়পরতা নব্বইভাগ মানুষ হয়তো দাদুর এই স্বচ্ছ দৃষ্টি দ্বারাই বিষয়টির মূল্যায়ন করছে, ব্যাখ্যা করছে। রাজনীতির সমস্ত শরীরে কোথাও মানুষের একবিন্দু কল্যাণ নিহিত রয়েছে এমনটা বিশ্বাস করা মারাত্মক ভুল, সুবিনয় অন্তত তাই জানে। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষের স্বার্থেই রাজনীতি পরিচালিত হয়। দুর্গন্ধময় তার শরীর, সারা গায়ে কোনো না কোনো মানুষের রক্তের দাগ লেপ্টে আছে। যুদ্ধ এবং রাজনীতি আধিপত্য আর অমানবিক শোষণের পাকাপোক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই সচেতনভাবে পরিচালিত হয়। সুবিনয় এখন জানে এই সব। তিন হাজার বছরের মানুষের যাবতীয় অর্জন ও অভিজ্ঞতার চাপে সে বেদিশা। তিন হাজার জালের লক্ষ কোটি প্যাঁচে সে আটকা পড়েছে কালের চক্রে। দাদুকে সে সব বুঝাতে যাবার কোনোই অর্থ হয় না। কারণ এ কাল দাদুর সম্পূর্ণ অচেনা, সেকালের কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই জীবনে। বুদ্ধির বলে আবিষ্কার উদ্ভাবনের দ্বারা মানুষ এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গেছে যেখানে ভূগোল ভেদ অনুপস্থিত। দেহকোষের ভাষা পাঠ করে মানুষ তার অভিব্যক্তি অনুযায়ী এক অমৃত ভবিষ্যত নির্মাণ প্রয়াসী। কিন্তু বড় দুর্বোধ্য সে সব ভাষা। জীবনের একালের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে অনুযায়ী এক একটা ভাষারূপ গড়ে ওঠেছে —প্রয়োজনের গ্রন্থিতে বাঁধা সেসব ভাষার আদল। বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি, শব্দ, বাক্যসীমানা পেরিয়ে মানবভাষা এখন বহুধা বিভক্ত। যুদ্ধের ভাষাও পাল্টে গেছে এই প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের যুগে। রাষ্ট্রক্ষমতা ও ভূখণ্ড দখল ছিল সেকালের যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেসব যুদ্ধের সম্পর্ক- যে খুব বেশি ছিল এমন নয়।

এখন যুদ্ধ মানেই ভূখণ্ড দখল করা, নারী অপহরণ করা নয়— আজকাল যুদ্ধ মানেই জাতির মস্তিষ্ক দখল করা, চিন্তার আধিপত্য বিস্তার, বাজার দখল। এ সবের জন্য ভূখণ্ড দখলের প্রয়োজন পড়ে না। জাতির প্রতিনিধিত্বশীল মস্তিষ্কগুলো দখল করা চাই; এমন কিছু চিন্তা সংক্রমিত করা দরকার যেগুলো আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। বাজার দখল করবার কৌশল অতি সরল— আগ্রাসী জাতির উৎপন্ন দ্রব্যে দখলকৃত দেশের বাজার পরিপূর্ণ কর তবেই হলো। আরও আছে বিচিত্র সব পদ্ধতি। এসবই তো চলছে বিশ্বময়। বাজার এখন মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানায় বাতাস কেটে উড়ছে, কখনও প্রমত্ত ষাঁড়ের মত লেজ উঁচিয়ে দিগন্ত রেখা পার হয়ে যাচ্ছে অপর দিগন্তাভিমুখে। এই যুদ্ধের রীতি আলাদা, আলাদা এর কৌশল। এ যুদ্ধে রক্ত ঝরে না, কেবল মানুষগুলো মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মত নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিংবা প্লাবিত নদীর কচুরির মত ভাসতে থাকে অনিকেত অজানায়।

দাদু এই যুদ্ধের দর্শক, সতেরশ সাতান্ন সালের পলাশীর প্রান্তর থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরতে থাকা ক্লাইভকে দেখবার জন্যে রাস্তার দুই ধারে ভিড় করা দর্শকদের মত নিষ্ক্রিয় দর্শক। যে-বিশ্ব ব্যবস্থায় মানুষ নিজগৃহে পরবাসী তার অভ্যন্তরের হিংস্র, কুটিল, কুৎসিত, নিষ্ঠুর রূপটি উপনিষদ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থা প্রয়োজনকে অজস্র রূপে, বিচিত্র আঙ্গিকে ও ভঙ্গিতে মানুষের দোরগোড়ায় অপরিহার্য করে পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিদিন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী মনোহারি সব উপকরণ। দাদুর পক্ষে আমার অসহায়ত্ব কি করে বোঝা সম্ভব! নিজের অজানতে বাজারে যাবার আগেই আমার পছন্দ বিক্রি হয়ে যায়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আমি যে জীবন যাপন করি তা নিয়ন্ত্রণ করে বহুজাতিক কোম্পানির মালিক। তার রুচিই আজ আমাদের রুচি, তার স্বাদ আমাদের সবার রসনার স্বাদ। আমাদের সবার শরীরের মাপ তার মুখস্থ— আমার স্ত্রীর অন্তর্বাসের মাপ সেও তার অজানা নয়। না হলে বাজারে গিয়ে যার যার মাপে মাপে কাপড় পায় কি করে মানুষ! একালের ভগবান, বহুজাতিক কোম্পানি ও তাদের মালিক— হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন ও মৃত্যুর বিধানদাতা, সর্বময় ক্ষমতার মালিক। এই তো দিন পনের আগে সুবিনয়ের দাদার বন্ধু জাহিদ সারোয়ার এসেছিল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে— জাহিদ কানাডায় থাকে বিশ বছর। সময়ের ব্যবধি বাস্তব কারণেই সুবিনয়দের পরিবারের সাথে জাহিদের দূরত্বের একটা দেয়াল গেঁথে দেয়। কুড়ি বছর পর দেশে ফিরেই জাহিদ সারোয়ার ঝাপসা স্মৃতির প্রান্তর পেরিয়ে বন্ধনের সূত্র ধরে টান দিলে দুপক্ষের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। কথা হয় দীর্ঘ সময় ধরে, পালা গানের মত এক একটা প্রসঙ্গ ধরে কথা চলে টানা তিনদিন।

জাহিদ ভাইয়ার সঙ্গে আলাপের প্রথম পাঁচ মিনিটেই সুবিনয় উপলব্ধি করে এ লোকটি ফুতলা গাঁয়ের সেই জাহিদ নয়, কানাডার অভিবাসী নাগরিক

জাহিদ সারোয়ার। কুড়ি বছর আজোহিদ ভাইয়ের সঙ্গে এই নতুন লোকটির আকৃতিগত মিল হয়তো পরিচিত জনের চোখ এড়াবে না কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্য একেবারেই অকল্পনীয়। আমার সঙ্গে জাহিদ সারওয়ারের বয়সের ব্যবধান কম করে হলেও সাত বছর। আমার তেত্রিশ জাহিদ ভাইয়ার তবে চল্লিশ। যে সমাজে তিনি বাস করছেন, যার উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে জড়িত তার প্রভাব জাহিদ ভাইয়ার ভাবনা, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। খেলোয়াড়ের সমস্যাগুলো গ্যালারিতে বসে শনাক্ত করা যতটা সহজ ততটা মাঠে খেলতে খেলতে হয়তো নয়। একইভাবে আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলো আমার নিকট যতটা সরল জাহিদ ভাইয়ের নিকট তা নয়— তার বিশ্লেষণে গোটা সমাজ ও এর সমস্যার বিচিত্রতা ভিন্ন রূপে মূর্ত হয় আমার চোখে। জহিদ ভাই মুহূর্তে একটা মৌটুসী পাখিতে পরিণত হয় আমার চোখে। গহন অরণ্যে ফুল ও কচি ফলের ভিতর থেকে মধু চুষে নেবার জন্য মৌটুসীরা যে কায়দায় চিকন ঠোঁট ব্যবহার করে জাহিদ ভাই চারপাশের সমস্যগুলোর ভিতর ঠিক একই কৌশলে ঢুকে যান। আমি অবাক হয়ে শুনি, জাহিদ সারোয়ার বলতে থাকেন, যা ভাবি নাই এখন তা জলের মত পরিষ্কার চলচ্চিত্রিক হয়ে ওঠে তার অসাধারণ বিশ্লেষণে। তিনি বলেন— "বাণিজ্য অর্থনীতির নিয়ন্তাদের কৌশল হল, যে কোনো উপায়েই হোক মানুষকে বাজারে আটকে রাখা চাই। মানুষ যতক্ষণ বাজারে থাকবে তক্ষণ সে কেনা-কাটায় ব্যস্ত থাকবে। শপিংমলগুলো সেই উদ্দেশ্যেই এত আকর্ষণীয় করে নির্মাণ করা হয়। খাদ্য, বিনোদন, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বসবাসের সুবিধা রেখেই আজকাল শপিংমল নির্মিত হচ্ছে। বসতবাড়ির চাইতে শপিংমল সুন্দর, খোলামেলা। মানুষ সব সময় বাড়ির বাইরে অবস্থান করে বলে ইদানিং এক কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ির চাহিদা বাড়ছে। বাড়ির মালিক, শপিংমলের মালিক এবং কারখানর মালিক অভিন্ন ব্যক্তি— সুতরাং সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ এক ব্যক্তির হাতেই। শিল্পকারখানায় বিপুল অঙ্কের বেতন দিবে তোমাকে, ছ'মাসে দুবার বাসা ভাড়া বাড়াবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় পণ্য হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত টাকা যখন নিজের পকেটে তুলে নেবে তুমি তখন আবার শূন্যহাত। বাজার আর্থনীতিক ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদক মালিক হলো সেই জাদুকর, যে, দৃশ্যত সমুদয় টাকা তোমার হাতে তুলে দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে থাকে তার হাতেই। যদি দেয়ও, দেওয়ামাত্র তোমার হাত থেকে টাকা কোন্ অবস্থায় কীভাবে তার হাতে চলে যাবে তুমি বুঝতেও পারবে না। সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মানুষের জন্য এর চেয়ে জটিলতম সময় পৃথিবীতে আর আসে নাই। অক্টোপাশের স্বভাবে কর্পোরেট-সমাজ উৎপাদক শ্রমিক ও ক্রেতা সাধারণকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে তারপর রক্ত শুষে ছুড়ে ফেলে দেয়।"

জাহিদ সারোয়ারের কথা শুনতে শুনতে সুবিনয় তন্ময় হয়ে ভাবে, — সমগ্র ব্যাপারটা সে কোনো দিনই ওভাবে খতিয়ে দেখেনি। জাহিদের অন্তর্দৃষ্টি তাকে মুগ্ধ করে। জীবন ও সমাজকে দেখবার এই গভীরতলস্পর্শী সূক্ষ্মদৃষ্টি কীভাবে অর্জন করা যায় তা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। সেই ভাবনার পাতা-পৃষ্ঠা উল্টাতে গেলে মরচে ধরা কানা আধলা ঘষতে ঘষতে যেমন তার একটা চকচকে পিঠ বের হয় তেমন করেই দৃশ্যমান হয় সময়ের আড়াল হওয়া জীবন্ত অথচ দুঃখ ভরা একখণ্ড অতীত।

সুবিনয়ের দাদা সুশান্ত ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি'র সক্রিয় সদস্য)। জাহিদ সারোয়ারের সঙ্গে দলের সূত্রেই তার বন্ধুত্ব। অভ্যন্তরে কি উদ্দেশ্য ছিল তা জানা নেই, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে সাধারণ্যে এই ছিল প্রচার। এই মহান আদর্শ-কথা সমগ্র দেশে রাতারাতি ছড়িয়ে গেলে এই নতুন দলের বার্তা, সংগঠনের আদর্শ সানন্দে গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ কর্মীর জন্ম হলো। কারণ তাদের অন্তরে গভীর ক্ষত ছিল। সহস্র বছর ধরে শোষণ-পীড়ন, নির্যাতন-বঞ্চনার শিকার দেশীয় শ্রমজীবী মানুষ সত্যি সত্যি মুক্তির স্বপ্নে উজ্জীবিত হয় ১৯৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধ শেষে একটি নতুন স্বদেশ পেলেও শ্রমজীবী সাধারণের মুক্তি আসেনি— তাই সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসতে পারে এমন বিশ্বাসের নীড়ে ডিম ফুটাতে চেয়েছিল এদেশের মানুষ। সত্যি যে মানুষগুলো জেএসডি'র কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল বলেই ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র দেশে দলটি প্রার্থী দিতে সমর্থ হয়। জাতীয় রাজনীতির হৃদপিণ্ডে কোন্ অচিন অসুখ দেখা দিয়েছিল তা একটা বস্তুনিরপেক্ষ গবেষণার দাবি রাখে— কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর কিছুর অস্তিত্ব-যে ছিল তাতে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রচণ্ড ওলট-পালট চলছিল ভিতরে ভিতরে। যুদ্ধপরবর্তী কালের সামাজিক-আর্থনীতিক দুরবস্থায় রাজনৈতিক বিচিত্র টানাপোড়েন জনগণের জন্য যুগজন্মের অভিশাপ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় প্রাণসংহার ও সম্ভ্রম হরণ করে চলল জনপদ থেকে জনপদে। অভাবনীয় ছিল সে পরিস্থিতি। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিও ছিল এই দুরবস্থা সৃষ্টির আড়ালে অত্যন্ত সংগোপনে। জাতির জনকের নৃশংস হত্যার ঘটনা অতঃপর ভিন্ন এক বাংলাদেশের জন্ম দিল।

দেশের সমগ্র জনগণের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল সে পরিস্থিতি। জেএসডি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত— মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদি শাস্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ জেলখানায় থাকা অবস্থায় দলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে। দেশের কর্ণধার এক কালের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল জিয়উর রহমান। জেনারেল আইউব, ইয়াহিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশাসনিক কৌশল প্রয়োগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞায় সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক। হাজার বছরের ইতিহাস, ঐহিত্য এবং মানুষের আন্দোলন, সংগ্রাম, একটি জাতীয় নির্বাচন এবং পরবর্তী নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের রক্তদানের স্মৃতি তাঁর মস্তিষ্ক থেকে উধাও তখন। মহান সংবিধান পরিবর্তন করে তিনি মহম্মদ আলী জিন্নাহর কায়দায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে নয়া পাকিস্তানের দিকে ঠেলে দিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেলো সেনাবাহিনী। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হলো অস্থায়ী ক্যান্টনমেন্ট। অকাতরে ধরপাকড়-নির্যাতন-নিপীড়ন চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর। জাসদকর্মী ও কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য ছিল মূল লক্ষ্যবস্তু। অজস্র তরুণ মেধাবীকর্মীকে হত্যা করে সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ। সুবিনয়ের দাদা সুশান্ত তাদের একজন।

দাদাকে যে রাতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য এসে তুলে নিয়ে গেল সে রাতে বাবার হৃদরোগটা আকস্মিকভাবে বেড়ে যায়। ব্যথাটা ক্রমে বাড়তে থাকে। দাদাকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় যখন আমরা এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছি তখন বাবার অসুখটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দাদুর সঙ্গে আমি ছুটে বেড়াচ্ছি দাদার শেষ অবস্থা জানবার জন্যে, বাড়িতে মা একা। মা পাশের বাড়ির হরি কাকার সহায়তায় বাবাকে জেলা শহরে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু নিলে কি হবে, সব তখন শেষ— ডাক্তার দেখে বললেন অনেক আগেই চলে গেছেন। তখন জেলা শহরগুলোতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সামরিক আদালত স্থাপন করেছিলেন। বিচারে দাদার মৃত্যুদণ্ড হয়। সকালে আর্মি ক্যাম্প থেকে দাদার লাশ নিয়ে ফিরে দেখি বাবার লাশ চিতায় তোলার প্রস্তুতি চলছে। বাবার পাশে দাদার লাশ রেখে আমি জ্ঞানহারা মায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। দাদা যেদিন ধরা পড়ে সেই রাতেই জাহিদ সারোয়ার আত্মগোপন করে। তারপর জার্মানিতে জেএসডির কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর দেশে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যুক্তরাজ্য যায় এবং সেখান থেকে কানাডা। সেখানে গিয়ে টরেন্টো থেকে পিএইচডি। সেই ঘটনার পর আজই প্রথম দেখা জাহিদ সারোয়ারের সঙ্গে।

আমাদের সেদিনে আর এদিনে কোনো তফাৎ নেই কিন্তু জাহিদ ভাইয়ের আছে। তিনি এখন কথায় কথায় বলেন, 'আমাদের কানাডায় সব কিছু জীবনের বিস্তার ও বিকাশের জন্য তৈরি করা। জীবনের সুখ কীভাবে নিশ্চিত করতে হয় আমরা জানি। এদেশে কিচ্ছু হবে না।' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম, 'তা তো হবার কথাই না, আপনাদের মতো মানুষ যদি অন্যের দেশকে নিজের দেশ করে নেয় তা হলে যে-দেশ আপনাদের জন্ম দিয়েছে তার দুর্দশা তো পৃথিবী ধ্বংসের দিন পর্যন্তই থাকবে। পাঁচ বছর কি দশ বছর কিংবা প্রতিবার ফেব্রুয়ারি মাসে আসবেন স্মৃতির ফেনা উড়িয়ে আত্ম সুখের তালিকা ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবেন পরিচিত জনের হাতে! দেশের আর কি হবে! সুশান্ত দা বেঁচে থাকলে হয়তো আপনার মতোই একজন হতো, তার চাইতে ভালো হয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে মরেছে! ছি জাহিদ ভাই!

দাদু অবসরভোগী সরকারি কর্মচারী। পাকিস্তান সরকারের অধীনে প্রথম তিন বছর বিনা বেতনে এবং তারপর পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে চাকরি করতেন। তিনি কোনো অবস্থায়ই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, এক কেপি

করল্লার দাম ১২০ বা ১৫০ টাকা হতে পারে। এমন অনেক কিছুই তাঁর বিশ্বাসের লগিতে থৈ পায় না। বিষয় ভাবনাও এখন বিলুপ্তশাস্ত্র-মন্ত্র এবং দৈবশক্তির পাতা-পত্রালির ফাঁক দিয়ে দাদু জগৎটাকে একটি বিন্দুর অবয়বে দেখেন এবং সেই দর্শনের অভিজ্ঞতায় যে-বিস্ময় জাগ্রত হয় তার বলেই উচ্চারণ করেন—

'ভগবানের নিলের কি আর শেষ আছে! জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কত নিলে তার। একবিন্দু জল থিকে মানুষ গড়ে, চিৎ-শক্তির কত শত রূপে প্রকাশ। হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, জয় শিব শম্ভু, জয় মা দুগ্‌গা।' সমস্ত সনাতন ধর্ম একাকার করে ফেলেন আপন খেয়ালে। পলকমাত্রে সহস্রবার তেত্রিশ দেবতার নাম জপেন দাদু। শারীরিক অক্ষমতা এবং তার চোখের উপর নিভে আসা আলোর উল্টা পিঠে ধূসর গোধূলির ঘূর্ণিনাচন যে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার চিত্র অঙ্কন করে তা কেবল অনড় বিশ্বাস জাত। মূলে তার কোনো অস্তিত্ব আছে কি নেই কেউ জানে না— শেওলার শরীর পিচ্ছল কিন্তু শেওলাপড়া বিশ্বাস অভাবনীয় শক্ত। দাদু সেই বিশ্বাসের হাঁটুতে ভর দিয়ে দিগন্তে হারাতে থাকা কুসুমবর্ণ সূর্যকে অন্তিম প্রণাম করছেন রোজ। এবং সব কিছুতেই ঝরছে তাঁর অসীম মুগ্ধতা। হয়তো আর একবার তিনিও যৌবনের উঠানে বুক চিতিয়ে সোজা দাঁড়াতে চান। সংগুপ্ত প্রার্থনাকালে হয়তো তাই চান তাঁর পরমেশ্বরের কাছে। হয়তো সকল মানুষই তাই করে। দাদু সব বলেন কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্যি সত্যি কি চান তা বলেন না। দাদু যে সত্যের সিন্ধুকের তালা ভাঙতে বদ্ধপরিকর আমার পথ সে গাঁয়ে প্রবেশ করেনি। আমি জীবনের সহস্রমুখো বিচিত্রতার দিকে তাকিয়ে অভিভূত। যুক্তির নাটাইয়ে যত সুতা জন্ম থেকে গুছিয়েছি তা সব ছাড়তে ছাড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ক্ষান্তি নেই। মনে মনে বলি—

হায়, নির্বোধ! ক্ষুধার্ত কুমীরের দাঁতের ফাঁকে কি অসহায় আত্মবিসর্জন!
অসম্ভবের মার্বেল পাথরে গেঁথেছ অনৃত-স্বর্গ, হে মানুষ!
নড়বড়ে সিঁড়ির মধ্যবর্তী ধাপে তুমি অনড় একাকী
অন্ধকারে আলোর-টগর ফোটাও নিশ্চিত নিটোল বিশ্বাসে—
যা অন্ধকার তাই আলো, সকল অমঙ্গলেই নিহিত মঙ্গল
আমার হাতে নেই কোন ইচ্ছারই বীজ, নতজানু ক্রীতদাস আমি
অথচ তোমার হাঁটুর নিচে বসে দীর্ঘ গলার ধবল সারস দেখি পালক খসিয়ে উড়ে
কেবল তুমি ভূপাতিত শাপভ্রষ্ট ক্লিব; দেখি
সঙ্গম তৃষ্ণায় কাতর ঈশ্বর, মর্তনারীর স্তনের বোঁটায় জ্বালায় কামের চিতা
'হও' নপুংসক এই শব্দের ঔরসে সব হয় কেবল মর্তনারী বাদে
তাই তো চলে তার প্রতনু দেহের উপর অন্যায় বলাৎকার— শাস্ত্রে, পুরাণে
এই ঈশ্বরের দীর্ঘ ছায়া, তার হিংস্র নখরবিদ্ধ নারীর রক্তাক্ত শরীর
ইতিহাসের চষাক্ষেতে এই সব শুকনো পাতা কুড়িয়ে বেলা যায় তোমার
সহস্র বৎসর; আর এক জনমের লোভে আপন কঙ্কালে বুনে যাও সাধের নকশী কাঁথা...
আমার ওসব নেই,
অমাবশ্যার ঘন অন্ধকার উড়নী ঘুরাতেই
কাঁকাল থেকে জীবনকে নামিয়ে রেখেছি বিষপিঁপড়ের বাসায়
তক্ষক সময় ডাকে— প্রাণের গহীনে বাজে মরণের ডঙ্কা,
ধাবমান জীবনের পেছনে ছুটছি স্খলিত উল্কাশিলা : ধুলপড়া, পানিপড়া, ঝাড়-ফোঁক, কীটদষ্ট শাস্ত্র
বিস্বাদ সব— জীবনের মুক্তি চাই মর্তে, মরণজয়ী জীবন স্বর্গ-মর্ত-পাতাল স্পর্শী মহাকাব্য যেমন—

দাদু আর সুবিনয়ের এই বিরোধের অন্তর্বর্তীস্থলে মাঝে মধ্যেই এসে পড়েন মা প্রসন্নময়ী। মা প্রাচীন বাঁশঝাড়ের সেই পরিপক্ব বাঁশটি যে, আর সব বাঁশের আশ্রয়— শিকড়-বাকড়ে জড়িয়ে আছে সবাই। সদা প্রসন্ন এই নারীকে সুবিনয় তার ক্ষুদ্র বোধ-বুদ্ধির ফিতায় মাপতে পারেনি কোনো দিন। যেনো অতল সমুদ্র, সকল নদীবাহিত নষ্ট, স্বচ্ছ, হাজামজা সব ধরনের জলের আধার— বিয়ের পর সুখ হয়নি ছোট মাসির, বিচ্ছেদের জ্বালা জুড়াতে এসেছেন দিদি প্রসন্নময়ীর কাছে— সান্ত্বনার শীতল জলের এক হাঁড়ি তার মাথায় ঢেলে দিলেন। দিন দুয়েক পর ছোট মাসির ঠোঁট জোসনায় থরথর। বড় পিসির মেজ ছেলে ঠিকাদারি ব্যবসায় ঠুকা খেয়ে ছিটকে পড়েছে ব্যবসার সদর দরজা থেকে মুনাফার রাস্তার ওপারের

এখন যুদ্ধ মানেই ভূখণ্ড দখল করা, নারী অপহরণ করা নয়— আজকাল যুদ্ধ মানেই জাতির মস্তিষ্ক দখল করা, চিন্তার আধিপত্য বিস্তার, বাজার দখল। এ সবের জন্য ভূখণ্ড দখলের প্রয়োজন পড়ে না। জাতির প্রতিনিধিত্বশীল মস্তিষ্কগুলো দখল করা চাই; এমন কিছু চিন্তা সংক্রমিত করা দরকার যেগুলো আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। বাজার দখল করবার কৌশল অতি সরল— আগ্রাসী জাতির উৎপন্ন দ্রব্যে দখলকৃত দেশের বাজার পরিপূর্ণ কর তবেই হলো। আরও আছে বিচিত্র সব পদ্ধতি। এসবই তো চলছে বিশ্বময়

লোকসানের নর্দমায়— তাকে উদ্ধার কে করে! প্রসন্নময়ীর হাত ধরে উচ্চগ্রামে নাকি সুর তুললেন বড় পিসি— চোখের জল, মুখের হাসি কোন্‌টার-যে পিসির নিকট কত দাম বোঝা গেল না। দুটোই পর্যাপ্ত ব্যয় করলেন। একদিন প্রসন্নময়ীর সিন্ধুকের ডালা খুলে গেল হঠাৎ— তারপর বিদায়কালে বড় পিসি গদগদচিত্তে মার কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। তিন মাস পরে বড় পিসির মেজ ছেলে চণ্ডীচরণ বাইক হাঁকিয়ে গলায় সোনার চেইন ঝুলিয়ে মামিকে প্রণাম করতে এলে অবাক হলাম আমি। আমার মা প্রসন্নময়ী— আমি তাঁর জ্যোর্তিময় অন্তরটাকে আস্ত দেখতে পাই— আমার চোখের ওপর বহু খাঁজকাটা অজস্র কোণবিশিষ্ট হীরকখণ্ডের মত জ্বলে তাঁর প্রশস্ত হৃদয়।

কোন সহস্রাব্দপ্রাচীন ভবনের মত ফাটলধরা, খসেপড়া, ধ্বসে যাওয়া দাদুর দেহটার দিকে তাকালে আজকাল দাদুর কথা খুব ভাবি না— কারণ তিনি আর ক'দিন! মনটা বড় তড়পায়— সুবিনয় ভাবে, অনেকক্ষণ ভাবে। মেখলার সঙ্গে তার সম্পর্কের গ্রন্থিটা আর একবার টেনে পরীক্ষা করে— কতটা শক্ত, খুব মজবুত মনে হয় না, অনেক দিন নেড়ে চেড়ে দেখেছে— খুব বেশি দূর এগাতে পারেনি। এগোনো যায় না। মানুষের সম্পর্ক তো! সত্যি সত্যি তার ওপর ভরসা করার উপায় নাই। মন খারাপ হয়ে যায়। বর্তমানকে ভেঙে অতীতে পরিণত করে সুবিনয়। কল্লোলিত জলের আবেগে একটা নদী জাগে। একটা দুরন্ত মাঠ ছুটে আসে। একঝাঁক সবুজ টিয়ে ঠোঁটে লাল টুকটুকে রঙের লিপস্টিক মেখে উড়ে যায়। জোনাকিরা একটা সন্ধ্যা আলোর তরঙ্গে ভরিয়ে দেয়। একটা চাঁদ আকাশ আকুল করে পৃথিবীর আঁচলের তলায় মুখ লুকিয়ে হেসে ওঠে। সুবিনয়ের মনে পড়ে তানপুরার তারের মত মেখলার শরীরটা সেই প্রগাঢ় সন্ধ্যায় ভরা ভাদ্রের পদ্মার মত বিস্তারে গভীরতায়, স্রোতে, তরঙ্গে বেসামাল হয়ে ওঠে। তাতে ডুবে গভীরতা মাপার প্রবল ইচ্ছেটাকে শিক্ষা আর শিষ্টাচারের রাশ টেনে কোনোক্রমে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু রক্ত তোলপাড় করতে থাকে অবদমনের অপরিমেয় দহন। সেই প্রবল অনীহাকে পুঁজি করেই কি মেখলা সেই মাদকাসক্ত অবিনাশকে জীবনসঙ্গী করে মানবজমিনে জাগতিক চাষাবাদে ব্যস্ত এখন?

'আমি অন্য রকম'

মেখলার এই কথাগুলো সত্যি অন্য রকম।